চেষ্টার
জিমনেসিয়াম
ফিউচারের
ক্যালসিয়াম
ঝংকার মাহবুব

চেষ্টার জিমনেসিয়াম
ফিউচারের ক্যালসিয়াম

ঝংকার মাহবুব

উৎসর্গ

আমার লাইফের গাইড
আমার লাইফের লাইটহাউজ
আমার বাবাকে হারিয়েছি আগস্ট ৪, ২০২০
সেই বাবার আত্মার মাগফিরাত কামনায়।

We would accomplish many more things if we did not think of them as impossible. –Vince Lombardi

চেষ্টার জিমনেসিয়াম ফিউচারের ক্যালসিয়াম

তবে শুরু হোক, হার্ডওয়ার্ক দিয়ে অর্জনের মিশন

চেষ্টার জিমনেসিয়াম ফিউচারের ক্যালসিয়াম

স্টুডেন্ট লাইফের জাতীয় খাবার হচ্ছে বাঁশ। সে জন্যই হয়তো– পরীক্ষা এলে টিচাররা বাঁশ দেয়। রেজাল্ট খারাপ হলে পাশের বাসার আন্টি বাঁশ দেয়। প্রেম করতে চাইলে যে ফ্রেন্ডটা হেল্প করতে পারত সেইই উল্টা তার নিজের সঙ্গে আংটা লাগিয়ে বাঁশ দেয়। এই রকম শত শত কচি বাঁশ, কঞ্চি বাঁশ, আইক্কাওয়ালা বাঁশকে নাশ করতেই এই বই 'চেষ্টার জিমনেসিয়াম ফিউচারের ক্যালসিয়াম'।

যাতে বাঁশ খেয়ে বেদিশা, লাইফ নিয়ে হতাশা, ফিউচার নিয়ে কুয়াশা, ভাগ্যের তামাশা, সব দুর্দশাকে মুচড়ে ফেলতে পারো কুংফু স্টাইলে। ক্যালসিয়ামের পাওয়ার দিয়ে।

এই লেখাগুলাতে মাঝেমধ্যেই কিছু চলমান বাংলা এবং ইংরেজি শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এবং আন্তরিকতা বোঝাতে কখনো কখনো তুই বলে সম্বোধন করা হয়েছে। কারণ ঘনিষ্টতা বোঝাতে জনপ্রিয় কথাসাহিত্যিক আনিসুল হক– 'মহাশয় আপনি কি আমার দুঃখ হবেন' না বলে; তিনি বলেছেন, 'তুই কি আমার দুঃখ হবি? তুই কি আমার শুষ্ক চোখে অশ্রু হবি?'

এই বই লিখতে জীবনের ওপার থেকে আমাকে সাহস জুগিয়েছেন আমার আব্বু। আর পাশ থেকে সহযোগিতা করে গেছেন আমার আম্মু, আমার স্ত্রী কারিনা, ছোট ভাই হীরা, বোন রিটা, নিপুণ আর নূপুর। এ ছাড়া সব সময় সহযোগিতা করে গেছে লাবীব, শারাফাত, সাজু ভাইসহ আরও অনেকেই।

ক্যালরি ঝরালে, ক্যালসিয়াম বাড়বে। সেই প্রত্যাশায়

ঝংকার মাহবুব
jhankarmahbub.com

সময়ের এক ফোঁড় অসময়ের দশ ফোঁড়

এক বছর ধরেই সবকিছু কেমন জানি ওলট-পালট হয়ে যাচ্ছে শাবাবের। আগের মতো পড়তে ইচ্ছা করে না। পড়তে বসলেও পড়া হয় না। ক্লাসে যেতে আগ্রহ পায় না।

স্কুল-কলেজে যে শাবাব নিয়মিত ভোররাতে উঠে পড়ালেখা করত, প্রায়ই ফার্স্ট-সেকেন্ড-থার্ডের মধ্যে থাকত, সিলেবাস থাকত আপ টু ডেট, সেই শাবাবের এখন ৯০%-এর বেশি সিলেবাস বাকি। এইদিকে পরীক্ষারও তেমন বাকি নাই। তাই সে ভয় পাচ্ছে এইবার পরীক্ষা দিবে? নাকি দিবে না? কিন্তু এই জিনিস নিয়ে ডিসকাস করার মতো কেউ নাই। ফ্রেন্ডদের সঙ্গে সে অতটা ঘনিষ্ঠ না। আবার বাসার কাউকেও বলা যাবে না। আব্বু শুনলে তাকে খুন করে ফেলবে।

শেষ পর্যন্ত অনেক চিন্তাভাবনার পর মনে পড়ল ফাহিম সৌরভ ভাইয়ের কথা। ফাহিম সৌরভ ভাইয়া ঢাকা ভার্সিটির মাইক্রো বায়োলজি ডিপার্টমেন্টের ফাইনাল ইয়ারের স্টুডেন্ট। তুখোড় ডিবেট করেন। ঢাকা ভার্সিটি ডিবেটিং ক্লাবের প্রেসিডেন্ট। খুবই চমৎকারভাবে গুছিয়ে কথা বলেন। প্রায়ই পড়ালেখা এবং লাইফের বিভিন্ন জিনিস নিয়েই টিপস অ্যান্ড ট্রিকস ইউটিউবে শেয়ার করেন।

ভাইয়া, দুই দিন আগে একটা ভিডিও আপলোড দিছিলেন। সেই ভিডিওতে বলছিলেন কেউ চাইলে ওনাকে ই-মেইল করতে পারে। সেই ভিডিওর সূত্র ধরেই শাবাব সাহস করে ফাহিম সৌরভ ভাইকে বিস্তারিত লিখে একটা ই-মেইল পাঠিয়ে দিছে। আর ভাবছে ফাহিম ভাই হয়তো কখনোই রিপ্লাই দিবে না। তবে তাকে অবাক করে দিয়ে পরের দিনই ভাইয়া খুবই আন্তরিকভাবে বুঝিয়ে বলেছেন।

শোনো,

সেকেন্ড টাইম পরীক্ষা দিয়ে কেউ ফার্স্ট হয় না। পরের বছর ভালো করে এসএসসি, এইচএসসি বা অ্যাডিমশন টেস্ট দিব বলা পাবলিকরা, পরের বছরও ভালো করতেই পারে না; বরং বেশির ভাগই উল্টা খারাপ করে বসে। আমার দুইজন ফ্রেন্ডও এই ভুল করছিল। তাই আমি বলব, একটু চিন্তা করে দেখো—

অন্যরা যারা এই বছর পরীক্ষা দিচ্ছে, তারা যতটুকু সময় পাইছে তার সমান সময় তুমিও পাইছিলা। যদিও ওরা ওই সময়ে মোটামুটি সিনসিয়ারলি পড়ালেখা করছে। আর তুমি আরামসে ফাঁকিবাজি, টলটুবাজি, ভেরেন্ডাভাজি, যা পারছ সব করছ। আর এখন পরীক্ষা চলে আসায়– নেক্সট টাইম, নেক্সট ইয়ার, নেক্সট সেমিস্টারের গান ধরছ।

একটু খেয়াল করে দেখো– এক বছর ধরে তোমার যেই লাইফস্টাইল, তোমার যেই ফাঁকিবাজি, যেই সব ঢিলামি, সেইগুলা চেইঞ্জ না হলে আমি গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারি– তোমাকে আরও এক বছর না বরং আরও চার বছর সময় দিলেও তুমি যেই আন্ডামার্কা আছ, সেই আন্ডামার্কাই থাকবা। কারণ তোমার জন্য সময় ফ্যাক্টর না। সময় তুমি আগেও পাইছিলা। তোমার জন্য ফ্যাক্টর হচ্ছে ফোকাস অ্যান্ড ডেডিকেটেড থেকে পড়ালেখা না করা।

তাই আজকের পর তোমার ডিকশনারি থেকে নেক্সট টাইম, নেক্সট ইয়ার, নেক্সট সেমিস্টার, নেক্সট উইক, নেক্সট চান্স বলতে কিছু থাকলে সেগুলাকে ডিলিট করে দাও। কারণ–

পরেরবার ভালো করব বলতে কিছু নাই। এইটা জাস্ট এক বছর ফাঁকিবাজি করার পর আরও এক বছর ফাঁকিবাজি করার ধান্দা।

আর তুমি যদি সত্যিই চ্যালেঞ্জ নিতে চাও, তাহলে এই বছর চ্যালেঞ্জ নাও। করে দেখাতে পারলে, এই মাসে করে দেখাও। টাফটাইম ফেইস করে নিজের লাইফকে ট্রান্সফর্ম করার ইচ্ছা থাকলে, এই বছর করো। হার্ডওয়ার্ক করার মেন্টালিটি থাকলে, সেটা আজকেই স্টার্ট করো। নিজের ভিতরে গাটস থাকলে, সেটা আজকেই জ্বালাও। তোমার অ্যাবিলিটি গ্রো করার ইচ্ছা থাকলে, এই তিন মাসে অ্যাবিলিটি গ্রো করো। পরের মাস, পরের বছর, পরের বৈশাখের আশায় বসে থাকলে, তোমার পরের বৈশাখ কালবৈশাখী আপু খেয়ে দিবে।

ফোঁড়া না গেলে দিলে, কষ্টে কাটবে রাতভর

ফাহিম সৌরভ ভাইয়ের ই-মেইল পেয়ে শাবাব যতটা না সারপ্রাইজড তার চাইতে একটু বেশি কনফিউজড হয়েছে। ভাইয়া বলতেছেন দ্রুত পরীক্ষার প্রিপারেশন নেওয়া শুরু করে দিতে। কিন্তু সে কি পারবে? কারণ তার তো অনেক অনেক সিলেবাস বাকি। তাই সে কনফার্ম হওয়ার জন্য ফাহিম ভাইকে আবার ই-মেইল দিয়েছে।

ভাইয়া, আসলেই কি আমি শুরু করে দিব? আপনি কী বলেন?

সেই দিনই দুই ঘণ্টার মধ্যে ফাহিম ভাই রিপ্লাই দিছেন।

ধরো, তুমি নৌকায় করে কোথাও যাচ্ছ। হুট করে নৌকার তলায় ছোট একটা ফুটা দিয়ে একটু একটু করে পানি লিক হওয়া শুরু করছে!!! ধীরে ধীরে নৌকার ভিতরে পানি বাড়তেছে। তুমি কী ভাববে?—

এখন হালকা একটু রেস্ট নিয়ে আধা কেজি মোজমাস্তি করে দেই। আশপাশের প্রকৃতির সঙ্গে কয়েকটা সেলফি তুলে দেই। নৌকার সামনের অংশে টাইটানিকের মতো পোজ দেই। দুই ঘণ্টা পরে নৌকা যখন কিনারে যাবে, তখন আরামসে ফুটা বন্ধ করব।

সেই ভরসা নিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকলে কিংবা কী কী করা লাগবে, সেটা নিয়ে আধা ঘণ্টা ধরে প্ল্যান বা রুটিন বানালে। অথবা সমস্যাকে ইগনোর করে নিজের মুখকে হাঁ করে হাওয়া খাইতে থাকলে। তোমার কাম সারছে। তোমাকে আর নদীর কিনারে যাওয়া লাগবে না; বরং নদীর মধ্যেই তোমার সলিলসমাধি, পানিসৈনিক উপাধি সব চলে আসবে।

আর তুমি যদি মিনিমাম কমনসেন্সওয়ালা পাবলিক হয়ে থাকো তাহলে তোমার উচিত হবে নৌকার মধ্যে ফুটা দেখার সঙ্গে সঙ্গে তোমার সর্বোচ্চ জ্ঞান-বুদ্ধি দিয়ে সেটা বন্ধ করার চেষ্টা করা। আর কিছু খুঁজে না পেলে অন্তত নিজের একটা আঙুল দিয়ে হলেও নৌকার ফুটা বন্ধ করা।

সেই একইভাবে তুমি যেহেতু বুঝে ফেলছ, ধরে ফেলছ, রিয়েলাইজ করতে পারছ যে, তুমি এক বছর ধরে ফাঁকিবাজি, চরকিবাজি, মামদোবাজি, ছুঁচাবাজি করতেছ, ডাব্বা মারতেছ, খাম্বা হয়ে দাঁড়ায় আছ, গিট্টু পাকাইতাছ। তাই তোমার আর একমুহূর্ত দেরি করা ঠিক হবে না। বরং আজকেই তোমার ফিউচারের প্রতি টর্চার, পড়ালেখার প্রতি অবিচার, কনফিডেন্সের পাংচার রিপেয়ার করার অস্ত্রোপচার চালিয়ে, লাইফের পজিটিভ দিকে একটা গতিসঞ্চার শুরু করতে হবে।

কোনোভাবেই বলা যাবে না, আজকে থাক, আগামীকাল। এই সপ্তাহ যাক, পরের সপ্তাহ। এই মাসটা কচলাই, পরের মাসে। কারণ এই কচলানোর সুর, এই পিছলানোর গান, এই ভাঙা গিটার, ফাটা তবলা তুমি এক বছর ধরে বাজাচ্ছ।

সো, আজকের পর থেকে কোনো সিচুয়েশন, কোনো সমস্যা, ঝামেলা, প্যারা বা গ্যাঞ্জাম রিয়েলাইজ করার সঙ্গে সঙ্গে সেটাকে ফেইস করবা। সঙ্গে সঙ্গে সেই সিচুয়েশনকে হ্যান্ডেল করা শুরু করবা।

কারণ, লাইফে সমস্যা আসা সমস্যা না। অন্যরা সমস্যা দিচ্ছে, সেটাও সমস্যা না; বরং সমস্যা হচ্ছে— সমস্যা জেনেও সমস্যা সমাধানের চেষ্টা না করা। সমস্যা হচ্ছে, সমস্যাকে টিকিয়ে রাখা। সমস্যা হচ্ছে, সমস্যাকে বাড়তে দেওয়া। সমস্যা হচ্ছে, নিজের সমস্যাকে গুরুত্ব না দেওয়া।

আজকের পর থেকে যখনই সমস্যা উঁকি দিবে, যখনই সমস্যা চৌকির নিচে এসে আস্তে আস্তে কাশি দিবে, সঙ্গে সঙ্গে হারিকেন জ্বালিয়ে সমস্যাকে চিপে ধরবে। সমস্যার বিচি খিঁচিয়ে ধরবে। জায়গামতো ফোঁড়া ওঠা শুরু করলে, সঙ্গে সঙ্গে ফোঁড়া গেলে দিবে। টিপে দিবে। ফাটিয়ে দিবে। নচেৎ ফোঁড়া বড় হতে হতে তোমার দিনের ঘুম, রাতের ঘুম সব হারাম করে দিবে।

রিস্ক নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়, মুচড়ে ফেলে সংশয়

ঝড়ে নুইয়ে পড়া গাছ যেমন ধাক্কা দিলেও খাড়া হয়ে দাঁড়াতে চায় না, তেমনি শাবাবের মনেও সাহস আসি আসি করেও আসতেছে না; বিশেষ করে লাস্ট কিছুদিন হতাশা আর ডিপ্রেশনের চাপে বুঝে উঠতেছে না। মন মানতেছে না। ভরসা পাচ্ছে না। সত্যিই এইবার পরীক্ষা দেওয়া তার জন্য ভালো হবে নাকি হবে না। তাই সে আবার ফাহিম ভাইকে ই-মেইল দিয়েছে।

ই-মেইলের বিষয়বস্তু হচ্ছে এত দিন তো পড়ি নাই। একটা গ্যাপ হয়ে গেছে। অনেক কিছুই মনে নাই। এ ছাড়া এই কয়দিনে কি আর পুরা সিলেবাস কমপ্লিট করা সম্ভব? সময় তো বেশি নাই। মনে হচ্ছে এখন শুরু করাটাই রিস্ক হয়ে যাচ্ছে। অন্য সবাই তো লাস্ট কয়েক মাস ধরে পড়ে পড়ে সব উল্টায় ফেলছে। আর আমি যদি এত পরে শুরু করি। আমি কি পারব? শেষ পর্যন্ত যদি না হয়, তাহলে কী হবে?

ফাহিম ভাই ধৈর্য ধরে সেইম জিনিস আবার গুছিয়ে বলেছেন–

তুমি যদি এই বছর পরীক্ষা না দাও, তাহলে নেক্সট তিন মাস সিরিয়াস থাকবে না। তুমি ভাববে– আচ্ছা, এই বছর যেহেতু পরীক্ষা দিচ্ছি না। আর নেক্সট ব্যাচের পরীক্ষা তো অনেক দেরি আছে। ওরা যখন শুরু করবে। আমিও তখন শুরু করব। এই মনে করে তুমি আরও তিন মাস ফাঁকিবাজি করবে। তোমার ব্যাচের পোলাপান যখন পরীক্ষা দিবে, তখন তুমি উদাস উদাস দেবদাস হয়ে বসে থাকবে। অক্টোপাস হয়ে ফাটাবাঁশ জড়ায় ধরবে। ভাবুক ভাবুক ভান ধরবে।

আবার কিছুদিন পর যখন নেক্সট ব্যাচের পোলাপান পরীক্ষার প্রিপারেশন নেওয়া শুরু করবে, তখন তোমার নতুন উপসর্গ যোগ হবে– জুনিয়রদের সঙ্গে পরীক্ষা দিচ্ছি। ওরা আমাকে আপনি বলে ডাকে। ওদের ক্লাসের মেয়েরা আমাকে 'ভাইয়া' বলে ডাকে। ওদের ফ্রেন্ডদের বার্থডেতে আমাকে ট্রিট দেয় না।

শুধু এইটাই না। আরও ক্যাচাল আছে। তোমার অরিজিনাল ফ্রেন্ডরা কে কোথায় চান্স পাইছে, সেটা দেখে তোমার খারাপ লাগবে। ওরা

[illegible] কে কোথায় ঘুরতে গেছে। সেগুলা দেখেও তোমার মন খারাপ হবে, পড়তে বসলে পড়ায় মন বসবে না।

[illegible] হচ্ছে, পড়তেও মন চাইবে না। কারও কাছে হেল্পও চাইতে পারবে না। পুরাই বিতিকিচ্ছি একটা অবস্থা বাধিয়ে ফেলবে।

আর অন্যদিকে, তুমি যদি কষ্টেমষ্টে এইবার পরীক্ষা দেওয়ার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়ো। কোনো রকমে এইবার পরীক্ষা দিতে গেলে, পরেরবারের পরীক্ষা তো আর তোমাকে ছেড়ে যাচ্ছে না; বরং এইবার রেডি হয়ে পরীক্ষা দেওয়ার ডিসিশন নিলে এইবার যত সিরিয়াসলি পড়ালেখা হবে, সেটা তুমি যদি কোনো কারণে এইবার খারাপ করেও ফেলো। পরেরবারের জন্য অনেক অনেক প্রিপারেশন আগেভাগেই রেডি হয়ে থাকবে।

তাই, এই বছর পরীক্ষা দেওয়াটা তোমার জন্য কোনো রিস্কই না; বরং এক বছর দেরি করে পরের বছর পরীক্ষা দেওয়াটা তোমার জন্য আরও অনেক বড় রিস্ক।

ঠিকাছে?

We become just by performing just action, temperate by performing temperate actions, brave by performing brave action. –Aristotle

তিন মাসেই সারতে পারবে, সারা বছরের আমাশয়

শাবাব কাবাব হয়ে আবার ই-মেইল দিছে ফাহিম ভাইকে।

ভাইয়া, আপনি যদি একটু কষ্ট করে তিন মাসে পড়া ফিনিশ করার একটা রুটিন বা গাইডলাইন করে দিতেন, তাহলে খুবই ভালো হতো।

একদিন পর ফাহিম ভাইয়ের ই-মেইল এল।

আমি আমার ভার্সিটি অ্যাডমিশনের আগে করা একটা রুটিন চালাইছিলাম। দিনরাত সব এক করে এই রুটিন ফলো করছিলাম। সেটার জোরেই মূলত ঢাকা ভার্সিটিতে চান্স পাইছি। তাই সেই রুটিনটাই তোমাকে দিলাম।

– আর শোনো শাবাব। টানা তিন মাসের মিশনে নামলে। তিন মাসে কী করবে। কী কী উল্টায় ফেলবে, সেটা নিয়ে একদম চিন্তা করতে যাবে না; বরং চোখ বন্ধ করে শুরু করে দাও। হার্ডওয়ার্কের ওপর ভরসা রাখো। ফিনিশ করার চ্যালেঞ্জ নিয়ে নামো। ডিটারমাইন্ড থাকো। তাহলে জিনিসটা অনেক সহজ হয়ে যাবে। পুরা একটা বছরের পড়ালেখা কীভাবে দুই-তিন মাসে সুদে-আসলে কড়ায়-গণ্ডায় বের করতে পারবে, সেই জিনিসটা ম্যাথমেটিক্যালি এবং প্র্যাকটিক্যালি দেখায় দিব, যাতে সারা বছর ফাঁকিবাজি করা পাবলিকও কয়েক দিন অমানবিক পরিশ্রম করে অল্প সময়ের মধ্যে পড়ালেখাটা কড়ায়-গণ্ডায় আদায় করে নিতে পারে।

ধরো, মোটামুটি সিনসিয়ার ও সিরিয়াস স্টুডেন্ট কত ঘণ্টা পড়ালেখা করে? একদম সলিড পড়ালেখা বলতে গেলে– প্রতিদিন গড়ে ৩ থেকে ৪ ঘণ্টা। অর্থাৎ ছুটির দিন, আড্ডা, পিকিনিক বা হাবিজাবি জিনিস বাদ দিয়ে সপ্তাহে ২৫ ঘণ্টা সলিড পড়ালেখা করে। এখন চিন্তা করে দেখো–

এক বছরে আছে ৫২ সপ্তাহ।

২ সপ্তাহ যায় ২ ঈদে। বাড়ি যেতে। এনজয় করতে।

২ সপ্তাহ যায় আমাশয়, পেট খারাপ, বুক চিন চিন করতে করতে।

২ সপ্তাহ যায় হাবিজাবি ওয়ার্ল্ড কাপ বা টুর্নামেন্ট দেখতে।

১ সপ্তাহ যায় ঘোরাফেরা, সিনেমা দেখা, এই সব নিয়ে।

আর এই সব মিলিয়ে ৭ সপ্তাহ নাই। অর্থাৎ পুরা বছরের মধ্যে ৭ সপ্তাহ পড়ালেখাহীনভাবে যাওয়ার পর ৫২ সপ্তাহের মধ্যে বাকি থাকে ৪৫ সপ্তাহ। আর সে যদি প্রত্যেক সপ্তাহে ২৫ ঘণ্টা সিরিয়াস পড়াশোনা করে এই পুরা বছরে অর্থাৎ ৪৫ সপ্তাহে সে পড়াশোনা করে ৪৫ × ২৫ অর্থাৎ ১১২৫ ঘণ্টা।

এখন তুমি আজকের দিনের কথা চিন্তা করো।

সারা দিনে তোমার হাতে সময় আছে ২৪ ঘণ্টা।

৭ ঘণ্টা ঘুমাইলা।

২ ঘণ্টা গেল— খাওয়া-দাওয়া, গোসল, বাথরুম মিলিয়ে।

১ ঘণ্টা রিলাক্স করলা।

১ ঘণ্টা নোট-খাতা জোগাড় বা গোছানোর জন্য।

গেল ১১ ঘণ্টা। তারপরেও সারা দিনে তোমার হাতে থাকে ১৩ ঘণ্টা। তার মানে এক্সট্রা সিনসিয়ার হলে প্রতিদিন ১৩ ঘণ্টা পড়া সম্ভব। এখন ঐকিক নিয়মে সিম্পল একটা অঙ্ক করো।

১৩ ঘণ্টা পড়ালেখা করতে সময় লাগে ১ দিন

১ ঘণ্টা পড়ালেখা করতে সময় লাগে ১/১৩ দিন

১১২৫ ঘণ্টা পড়ালেখা করতে সময় লাগে (১/১৩) × ১১২৫ দিন

অর্থাৎ ১১২৫ ঘণ্টা পড়ালেখা করতে তোমার সময় লাগবে ৮৬.৫ দিন।

আর ৮৬.৫ দিন কিন্তু তিন মাস বা ৯০ দিনের কম। তার মানে যে সারা বছর সিরিয়াসলি পড়ালেখা করে সে বছরে ১১২৫ ঘণ্টা পড়ালেখা করে। আর তুমি তার সমপরিমাণ পড়ালেখা করতে চাইলে তোমাকে ডেইলি ১৩ ঘণ্টা করে পড়তে হবে। তাহলে তুমি ৮৬.৫ দিন বা তিন মাসে সারা বছরের পড়া পড়ে ফেলতে পারবে।

তবে ম্যাথমেটিক্যালি যেই জিনিসটা পসিবল। আমরা হিউম্যানরা সেটাকে তর্কের খাতিরে মেনে নিলেও মন দিয়ে বিশ্বাস করি না বা ফিল করি না বা বলতে চাই না এইটা পসিবল। তাই তোমাকে এখন

এইটা পসিবল না ইম্পসিবল, সেটা নিয়ে চিন্তা করা লাগবে না। তুমি পারবে কি পারবে না, সেটা নিয়েও সিদ্ধান্ত দেওয়া লাগবে না। তোমার অ্যাবিলিটি আছে কি নাই, সেটা নিয়েও আমরা গোলটেবিল বৈঠক করব না। তুমি জাস্ট দুইটা জিনিস মেইনটেইন করবা। আর বেশি কিছু না।

তোমাকে জেলখানায় ঢুকে যাইতে হবে

অর্থাৎ কে তোমার বাপ, কে তোমার মা, কে তোমার গার্লফ্রেন্ড বা বয়ফ্রেন্ড আর কে কে তোমার ফেসবুক ফ্রেন্ড অথবা টিকটক ফ্রেন্ড। সবাইকে ভুলে যেতে হবে। হান্ড্রেড পার্সেন্ট ডিসকানেক্ট হয়ে যেতে হবে। পুরা তিন মাস জেলখানায় থাকবা। সারা বছর যত ফাঁকিবাজি করছ, যত মোজমাস্তির রসে টসটস রসগোল্লা খাইছ। সেই রসগোল্লার রস, আনারসের রস, সব রস এখন কসকস করে বের করতে হবে। যাতে নেক্সট তিন মাস তোমার লাইফে পড়ালেখা, খাওয়াদাওয়া, বাথরুম, ঘুম ছাড়া আর কিছুই না থাকে।

তোমার লাইফস্টাইল চেইঞ্জ করা যাবে না

অর্থাৎ তুমি যদি লেইটে ঘুমাইতে যাও তাইলে তুমি লেইটে ঘুমাতে যাবে। আর তোমার যদি আগে ঘুমানোর ইচ্ছা থাকে আগেই ঘুমাবে। কখন নাশতা খাও, কখন গোসল করো, কখন রেস্ট নাও, এইগুলার টাইম চেইঞ্জ করার দরকার নাই। বাকি যতক্ষণ সময়ে জেগে থাকো ওই সময়গুলা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে কাজে লাগাইতে হবে।

এই দুইটা জিনিস ঠিক রাখতে পারলে নিচের পাঁচটা ট্রিকস অ্যাপ্লাই করবা। তার বাইরে বেশি কিছু চিন্তা করতে যাবা না।

১. তোমাকে কিছুটা ভ্যারাইটি আনতে হবে

ধরো, তুমি সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে চেয়ারের সঙ্গে নিজেকে বেঁধে ফেলবে। কিন্তু এক ঘণ্টা পরে তোমার আর ভাল্লাগবে না। পালায়ে বাঁচতে ইচ্ছা করবে। সে ক্ষেত্রে তুমি একটা ইন্টারেস্টিং কম্পিটিশনে

নেমে যেতে পারো। যেমন এই চ্যাপ্টার শেষ হওয়ার আগ পর্যন্ত আমি নাশতা খাব না। দেখি এক ঘণ্টার মধ্যে এই জিনিসটা শেষ করতে পারি কি না। যদি শেষ করতে পারি তাইলে আমার টার্গেটটা ফুলফিল হইল। না হইলে আমার টার্গেটটা ফুলফিল হওয়ার জন্য আরও ১০ মিনিট বেশি সময় দিলাম। তার মানে তুমি টাইম ভার্সেস টার্গেট একটা গেম খেললা। এই যে গেম খেলতে খেলতে তুমি নিজেই ভুলে যাবে যে, তুমি পড়ালেখা করতেছ।

২. ক্লেইম দ্য ব্রেক টাইম

ধরো, তুমি বাথরুমে গেলা। গোসল করতে করতে কিংবা ভাত খাইতে খাইতে মনে মনে তোমার পড়াটাকে রিভিশন দিয়ে দিলা। কিংবা ভাত খাইতে খাইতে প্লেটের পাশে বইটা খুলে রাখবা বা খাবারের প্লেট নিয়ে পড়ার টেবিলে চলে আসবা কিংবা রিকশায় করে কোথাও যাওয়া লাগতেছে, তখন পায়ের ওপরে বই খুলে রাখবা। সেলুনে গেলে সেলুনের টেবিলের সামনে একটা খাতা খুলে রাখবা। কোথাও লাইনে অপেক্ষা করতেছ, তখন হাতে একটা খাতা খুলে রাখবা কিংবা মনে মনে রিভিশন দিবা। কোনো একটা জিনিস ভুলে গেলে চট করে বই খুলে দেখে নিবা। এইভাবে প্রতিটা মুহূর্ত তোমার কাজে লাগবে।

আর দুনিয়ার মানুষ কী ভাববে? কী বলবে? সেই চিন্তা করার সময় তোমার নাই। কারণ দুনিয়ার মানুষ এসে তোমার পরীক্ষা দিয়ে যাবে না। তারা এসে তোমাকে চাকরি খুঁজে দিবে না। দুই মাসের পকেট খরচ দিয়ে যাবে না।

৩. স্টার্ট উইথ দ্য ইজিয়ার টাস্ক

ম্যাক্সিমাম সময় দেখা যায়, আমরা সবচেয়ে কঠিন জিনিসটা সবার আগে শুরু করি অথবা যেই সাবজেক্টটা কিছুই পড়া হয় নাই, সেইটা দিয়েই শুরু করি। ওইটা করতে করতে অর্ধেক সময় পার করে দেই। আর অগ্রগতি নাই দেখে হতাশ হয়ে যাই; বরং তুমি একটা টার্গেট নিয়ে নাও— আচ্ছা, আমার কোন সাবজেক্টটা বেশির ভাগ শেষ হয়ে

গেছে? ওইটা হয়তো কয়েক ঘণ্টা পড়লে বা ওই চ্যাপ্টারের ওইটুকু পড়লেই আমার চ্যাপ্টারটা শেষ হয়ে যাবে। তাই সেটা দিয়ে শুরু করবা। তাহলে দ্রুত অনেক জিনিস শেষ হয়ে যাবে। অল্পতেই ভালো প্রগ্রেস দেখতে পাবে। এতে কনফিডেন্স আরও অনেক বেড়ে যাবে।

৪. ফিক্সড টাইম ভেরিয়েবল কনটেন্ট

তুমি ঠিক করলা চার ঘণ্টা সময় ধরে পড়বা। তোমাকে চার ঘণ্টা মাস্ট পড়তেই হবে। সেটা যে সাবজেক্ট দিয়ে পড়তে শুরু করছ, সেটা ভালো লাগলে সেটা কন্টিনিউ করবা। কোনো কারণে সেটা ভালো না লাগলে বা আটকে গেলে সেটা বাদ দিয়ে আরেকটা ধরবা। সেটাও না পারলে অন্য আরেকটা ধরবা অর্থাৎ এই সাবজেক্ট না হলে অন্য সাবজেক্ট। এই চ্যাপ্টার না হলে অন্য চ্যাপ্টার। দরকার হলে দুইটা চ্যাপ্টার স্কিপ করে যাও। টার্গেট চেইঞ্জ করো। যা-ই করো না কেন, চার ঘণ্টা তোমাকে দিতেই হবে। প্রথম প্রথম একটু জোর করতে হবে। তাহলেই ধীরে ধীরে অভ্যাস হয়ে যাবে।

৫. ইম্পর্ট্যান্টকে ইম্পর্ট্যান্স দাও

পুরা বই একদম শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সব ধরে ধরে ফিনিশ করতে হবে, এমন কোনো কথা নাই বা সিরিয়াল ধরেই পড়তে হবে, তেমন কোনো কথাও নাই। তাই ইম্পর্ট্যান্ট টপিকগুলো আগে ঠিক করো। সেগুলা আগে শুরু করো। তাইলে তুমি অল্প সময়ের মধ্যে তোমার ম্যাক্সিমাম ইম্পর্ট্যান্ট জিনিসগুলা শেষ করে ফেলতে পারবে।

আর লাস্ট যে কথাটা বলব সেটা হচ্ছে, অবশ্যই তিন মাসের মধ্যে ফিনিশ করা পসিবল; বিশেষ করে ভর্তি পরীক্ষার আগে বা ইন্টারমিডিয়েট সেকেন্ড ইয়ারে। টেস্ট পরীক্ষার আগে। এসএসসি বা এইচএসসির আগে অবশ্যই পসিবল। তুমি জাস্ট দম বন্ধ করে লেগে থাকো। দেখবে সব অটো সাইজ হয়ে গেছে।

এই যে তুই, হ্যাঁ তুই। যে এই বইটা পড়তেছস। তুই কি কোনো প্রবলেমে পড়লে মুষড়ে যাস? ঝামেলায় পড়লে লুকানোর রাস্তা খুঁজস? নাকি কঠিন একটা আউটলাইন বানিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়স? নিজেই নিজেকে চ্যালেঞ্জ দেস? যদি চ্যালেঞ্জ দিয়ে থাকস এবং সামনে আরও চ্যালেঞ্জ নিতে চাস তাহলে নিচে লিখে দে। তুই নিজেকে নেক্সট লেভেলে নিয়ে যাওয়ার জন্য আজকে থেকেই কোন চ্যালেঞ্জটা নিবি?

তোর উত্তর–

দাঁত নাই, ব্রাশ নাই, খুঁজছে তবু পেপসোডেন্ট

আজকে সকালেই ফেসবুকে একটা পোস্ট দেখল শাবাব। ফাহিম সৌরভ ভাই ঢাকা ভার্সিটির ডিবেটিং ক্লাবে একটা ওয়ার্কশপ করাচ্ছেন 'ডিবেট মাস্টারিং টেকনিক ফর বিগিনারস' নামে। এই ওয়ার্কশপটা ঢাকা ভার্সিটির প্রথম বর্ষের স্টুডেন্টদের জন্য হলেও, বাইরের সবার জন্য উন্মুক্ত।

তাই শাবাব সাহস করে চলে আসছে ওয়ার্কশপের ভেন্যুতে। ওয়ার্কশপ শেষ হওয়ার পর তার সিচুয়েশনের কথা ফাইম ভাইকে জানাল। সে যেহেতু ভালো ভার্সিটিতে চান্স পায়নি। তাই সে কি সেখানে যাবে? নাকি যাবে না? গেলে ভালো হবে? নাকি পরের বছর আবার ট্রাই করবে?

শাবাবের সব কথা, ই-মেইলের কথা শোনার পর ফাহিম ভাই খুবই কাছের ছোট ভাই মনে করে বলতে শুরু করলেন।

প্রথম কথা– এক ঘণ্টার একটা পরীক্ষা, একটা জীবনের সবকিছু ডিফাইন করতে পারে না; বরং এক ঘণ্টার একটা পরীক্ষা, একটা লাইফের এক বছর; বড়জোর একটা লাইফের পরবর্তী চার বছর ডিফাইন করতে পারে। তার বেশি কিছু না। সো, তুই কোন ভার্সিটিতে চান্স পাইছস, সেটা দিয়ে তোর সারা জীবনের সবকিছু নির্ধারিত হবে না। শুধু নির্ধারিত হবে নেক্সট চার বছর তুই কোন জায়গায় থাকবি। কারা তোর ভার্সিটির ফ্রেন্ড হবে। কোন ক্যানটিনে তুই নাশতা খাবি। কোন জায়গার বাতাস তোর ফুসফুসে ঢুকবে। এইটুকই। এর বেশি কিছু না।

দ্বিতীয় কথা– জীবনের খেলার মাঠ কিন্তু একটা না; বরং স্কুল একটা খেলার মাঠ। স্কুলে কেউ ভালো না করলে, কলেজে গিয়ে ভালো করতে পারে। কলেজে কেউ ভালো করতে না পারলে, ভার্সিটিতে গিয়ে ভালো করার অপশন থাকে। ভার্সিটিতেও কেউ ভালো করতে না পারলে, প্রফেশনাল লাইফে ভালো করতে পারে। প্রফেশনাল লাইফে কেউ ভালো করতে না পারলে, হয়তো ফ্যামিলি মেম্বারদের জন্য অনেক কিছু করতে পারে।

তো, একটা-দুইটা লেভেলে, একটা-দুইটা সিচুয়েশনে, একটা-দুইটা পজিশনে খারাপ করে ফেললে, সেটার জন্য প্রেসার, ফ্রাস্ট্রেশন হওয়ার কিছু নাই; বরং একটু হার্ডওয়ার্কিং আর জেনুইন মানুষ হলে, সেখান থেকে উঠে গিয়ে অন্যখানে কিন্তু ঠিকই ভালো করতে পারবি।

তৃতীয় কথা– তুই তো সারা বছর ঠিকমতো পড়ালেখাই করস নাই। ফাঁকিবাজি করছস। লাস্ট কয়েক মাস জোড়াতালি দিয়ে যা পাইছস, সেটার জন্য শুকরিয়া আদায় কর। তা ছাড়া তোর চেষ্টা, তোর এফোর্ট, তোর হার্ডওয়ার্কের লিমিটের বাইরে গিয়ে বেশি বেশি এক্সপেক্ট করলে, বেশি বেশি মন খারাপ হবেই। গ্যারান্টি।

আর যদি মনে হয় তুই এর চাইতে আরও বেশি ডিজার্ভ করস বা আরও বেশি এক্সপেক্ট করস? তাহলে সেটা এক্সপেক্ট করবি তোর নিজের চেষ্টার কাছে। সেটা এক্সপেক্ট করবি নিজের পরিশ্রম করার অ্যাবিলিটির কাছে। আরও আরও বেশি দিন লেগে থাকার কাছে। কারণ তোর চেষ্টা দিয়ে যেটা পাওয়া উচিত সেটার ৭০-৮০% পাইলেই তোকে সেটা অ্যাকসেপ্ট করা উচিত। হ্যাপি হওয়া উচিত।

মনে রাখবি, দুনিয়ার কোনো আউটপুট এক্সপেক্টেশন দিয়ে ডিসাইডেড হয় না; বরং আউটপুট ডিসাইডেড হয় ইনপুট দিয়ে। এফোর্টের পরিমাণ দিয়ে।

মরণ কামড় বসায় দিতে লাগে শুধু কনফিডেন্ট

কিন্তু ফাহিম ভাই, আমার এক ফ্রেন্ড শামীম তো ঢাকা ভার্সিটিতে চান্স পাইছে। আমার আরেক ফ্রেন্ড রাফিয়ার তো শেরেবাংলা মেডিকেলে হইছে। ওইদিকে শাফিন যে স্কুলে অলমোস্ট ফেল করত। কলেজে একটু ভালো করত। সে-ও খুলনা ভার্সিটিতে চান্স পাইছে। আর আমি কী পাইলাম? না হইল ভালো ভার্সিটি, না হইল ভালো সাবজেক্ট? অথচ ওদের চাইতে আমি ভালো কলেজে পড়েছি। আমার এসএসসির রেজাল্টও ওদের চাইতে ভালো ছিল। ওরা কই চলে গেল। আর আমি কই রয়ে গেলাম। ফ্রেন্ড সার্কেলে তো আমার মানসম্মান থাকবে না। আমাকে সব সময় ছোট হয়ে থাকতে হবে।

– আরে শোন,

কে কোন স্কুল বা কলেজে পড়েছে, সেটা দিয়ে যেমন নির্ধারিত হয় না কে কোন ভার্সিটিতে পড়বে। সেই একইভাবে কে কোন ভার্সিটিতে পড়তেছে, সেটা দিয়ে নির্ধারিত হয় না, লাইফে কে কী করবে।

একটু চিন্তা করে দেখ– যদি ভালো কলেজে পড়লেই সব হয়ে যেত। তাহলে ঢাকা ভার্সিটি এসে বলত– আসো, তোমরা যারা যারা নটর ডেম, ভিকারুননিসা, হলিক্রস কলেজের, তোমরা সবার আগে আসো। তোমরা তোমাদের ইচ্ছামতো যার যে সাবজেক্ট পছন্দ, সেটা বেছে নাও। তারপর অন্যরা চান্স পেল কি পেল না, সেটা চিন্তা করা যাবে।

তবে বাস্তবে এমন কখনো হয় না। তাই দেখা যায় ভালো কলেজের ৫০% পোলাপানই দেশের সবচেয়ে ভালো ভার্সিটিতে চান্স পাচ্ছে না। তারা হয়তো সবচেয়ে ভালো জায়গায় না পেলেও মোটামুটি ভালো জায়গায় চান্স পেয়ে যায়। এমনকি সেই সব নামকরা কলেজের দুই-চারজন সব সময়ই পাওয়া যায় তারা কোনো ভালো জায়গায়ই চান্স পাচ্ছে না। তারাও কিন্তু সেই নামকরা কলেজের স্টুডেন্টই ছিল।

আবার অন্যদিকে কম নামকরা কলেজে দুই-চারজন সব সময়ই পাওয়া যায়। যারা ভালো ভার্সিটিতে চান্স পেয়ে গেছে।

মেইন কথা হচ্ছে কে ভালো করবে আর কে খারাপ করবে, সেটা তার বাড়ি, বাপের গাড়ি, মায়ের শাড়ি, পেটের নাড়ি, দাঁতের মাড়ি কোনো কিছুর ওপরেই নির্ভর করবে না। সেই আশা করলেও লাভ হবে না। বরং যে কলেজে হার্ডওয়ার্ক করবে, সে ভালো কলেজ বা খারাপ কলেজ যেখানেই পড়ুক না কেন সে ভালো করবেই। আর যে ভালো করে পড়বে না, সে ভালো কলেজে পড়ুক বা খারাপ কলেজে পড়ুক, সে ভালো ভার্সিটিতে চান্স পাবে না। এটাই স্বাভাবিক। এটাই বাস্তবতা।

বাস্তবতা মেনে নে। লাইফ অনেক ইজিয়ার হয়ে যাবে।

তবে, এইখানে একটা চিকনচাকন, আইকন মার্কা একটা সিক্রেট ফর্মুলা আছে। তুই যদি সেটা ধরতে পারস, বুঝতে পারস, তাহলে তোর অনেক কনসার্ন হাওয়া হয়ে যাবে। আমি বলতেছি। একটু ভালো করে খেয়াল কর।

কে কোন কলেজে পড়ছে, সেটা দিয়ে যেমন নির্ধারিত হয় না কে কোন ভার্সিটিতে চান্স পাবে। সেই একইভাবে কে কোন ভার্সিটিতে পড়ছে, সেটা দিয়েও নির্ধারিত হয় না, কে লাইফে কী করবে; বরং ভার্সিটি লাইফটাকে কীভাবে কাজে লাগাইছে। সেটা দিয়ে নির্ধারিত হবে সে লাইফে কী করবে। সে কারণেই দেখা যায়, নামকরা ভার্সিটির ৫০% পোলাপানের চাইতে কম নামকরা ভার্সিটির ১০% পোলাপান ভালো জায়গায় ভালো চাকরি পেয়ে যায়।

সামারি হচ্ছে– মরণ কামড় বসাইতে হলে কোন জায়গায় বসে কামড় দিতাছস, সেটা ইম্পর্ট্যান্ট না। ইম্পর্ট্যান্ট হচ্ছে কামড়টা বসাইতেছস কি না। বুঝতে পারছস?

ডলা খাইয়াও চেষ্টা করো, ধইরা ভাঙা বন্দুক

ফাহিম ভাই, ভার্সিটির কথা না হয় বুঝলাম। কিন্তু সাবজেক্টটাও তো ভালো না। আমার পাশের বাসার আন্টির মেয়ের টিচারের মামার বন্ধু বলছে এই সাবজেক্টের নাকি চাকরি নাই। ফিউচার নাই। ডিমান্ড নাই। ক্যারিয়ার নাই। তো, এই সাবজেক্টে পড়ব? নাকি পড়ব না? কী করব? কিছুই তো বুঝতেছি না। নাকি চান্স পেয়ে ভুল করে ফেলছি?

– আরে না। চার বছর পরে কী হবে সেই ডিসিশন তোকে এখনই নিতে হবে না। এমনকি এক বছর পরে তুই কই খাবি, কই ঘুমাবি, কই বাথরুম করবি, কার লগে ফুসকা খাবি– সেটাও তোকে এখন ডিসিশন নিতে হবে না। ফিউচার নিয়ে কনফিউজড বা হতাশ হওয়ার সময় এখন না; বরং এখন সময় হচ্ছে ফিউচার নিয়ে কিউরিয়াস হওয়ার। নতুন ভার্সিটি, নতুন লাইফ, নতুন ফ্রেন্ড, নতুন অধ্যায়কে উপভোগ কর। কাজে লাগানোর মিশন সেট করা নিয়ে ফোকাস কর। আমি কয়েকটা টিপস দিয়ে দিব। তাহলে ওভারঅল জিনিসটা তোর জন্য সার্ফ এক্সেলের মতো ফকফকা হয়ে যাবে।

তুই যে সাবজেক্টেই পড়স না কেন, সেই সাবজেক্টের ভালো ক্যারিয়ার, ভালো ডিমান্ড, ভালো ফিউচার থাকুক বা না থাকুক; তোর প্রথম টার্গেটই হবে ভালো করে পড়ালেখা করা।

কারণ, যারা ভালো করে পড়ালেখা করে তারা অনেক অনেক বেনিফিট পেয়ে যায়। তাদের ফ্যাকাল্টি হওয়ার চান্স থাকে। বিদেশে হায়ার স্টাডি করার রাস্তা অনেক সহজ হয়ে যায়। টিচারদের কাছে কোনো জব বা কোনো প্রজেক্টের অপরচুনিটি বা কোনো পার্টটাইম কাজের অফার এলে টিচাররা ভালো স্টুডেন্টদের আগে জিজ্ঞেস করেন। কারণ ভালো স্টুডেন্টদের সঙ্গে টিচারদের ডাইরেক্ট কানেকশন থাকে। সিনিয়র-জুনিয়র সবাই তাদের চিনে। নেটওয়ার্কিংও অনেক ইজিয়ার হয়ে যায়।

তবে লাইফে ভালো কিছু করতে হলে যে সবাইকে পড়ালেখার দিকে মনোযোগ দিতেই হবে। এইটা ছাড়া সবার লাইফ ভাঙা পাইপ হয়ে যাবে। তেমনটা ভাবার দরকার নাই। মাঝেমধ্যে ভার্সিটিতে এমন

কিছু পোলাপান দেখবি— যারা পড়াশোনায় অত ভালো না বা কোনো রকমে টেনেটুনে পাস করছে কিন্তু পড়াশোনার বাইরে কোনো একটা জিনিসে অনেক ভালো।

সেটা হতে পারে— কেউ কেউ হয়তো লেখালেখিতে ভালো। কেউ কেউ হয়তো ছবি তুলতে ভালো। আবার কেউ কেউ হয়তো পাবলিক স্পিকিং, নেটওয়ার্কিং বা ইংরেজিতে ভালো। কেউ কেউ আবার সিরিয়াসলি প্রোগ্রামিং শিখে। সেই লাইনে ভালো করার চেষ্টা করে। ফ্রিল্যান্সিং করে। গ্রাফিক ডিজাইনার হয়। সাংবাদিকতা শুরু করে দেয়। নতুন বিজনেস/স্টার্টআপ, ডিজিটাল মার্কেটিং। আরও কত-কী যে আছে। এদের অনেকেই সুযোগ পেলে পার্টটাইম কাজ করে। প্র্যাকটিক্যাল এক্সপেরিয়েন্স এগিয়ে রাখে। আর পরীক্ষা এলে একটু হালকা সিরিয়াস হয়ে পড়াশোনা কোনো রকমে চালিয়ে যায়।

আবার অল্প কয়েকজন আছে। তারা যে লাইনে বা যে সাবজেক্টে পড়াশোনা করতেছে, সেটা তাদের ভালো না। তাই তারা ভার্সিটিতে মোটামুটি কোনোরকমে পাস করার কাজ চালাতে থাকে। আর নিজে নিজে ইন্টারনেট থেকে তার পছন্দের জিনিস শিখতে থাকে। কারণ ইদানীংকালে তেলাপোকার বাম্পার ফলন থেকে শুরু করে মঙ্গল গ্রহে আলু চাষ পর্যন্ত এমন কোনো টপিক নাই যেটা ইন্টারনেটে পাওয়া যায় না।

মেইন কথা হচ্ছে, হয় তোর সাবজেক্ট তোকে ক্যারিয়ার দিবে। না হয় তোর চেষ্টা, তোর আগ্রহ, তোর হার্ডওয়ার্ক তোকে ডিফারেন্ট লাইনে ক্যারিয়ার দিবে। তবে দুইটার যেটাই করস না কেন, চেষ্টাটা তোকে চালাই যেতেই হবে। আজকে তোর কনফিডেন্সের বন্দুক ভেঙে গেলেও সেই ভাঙা বন্দুকটা তোকে ধরে রাখতে হবে। তামার বুলেট না থাকলে রাবারের বুলেট হলেও ঢুকাতে হবে। বারবার স্টিয়ারিংটা চাপতে হবে। তাহলেই— একটা না একটা কিছু বের হবেই হবে।

স্টুডেন্ট লাইফের কামাই দিয়ে ভরতে পারবে সিন্দুক

আরেকটা প্যারা আছে, ফাহিম ভাই। আমার আব্বু বলছে, ছোট দুই ভাইবোনের পড়ার খরচ, আম্মুকে ডাক্তার দেখানোর খরচ, দাদির ওষুধ: সব মিলিয়ে ওনার স্যালারি দিয়ে কভার হচ্ছে না। তাই আমাকে বলছে এই মাসের পর থেকে আমার পড়ালেখার খরচ, পকেট খরচ, ইন্টারনেট খরচ কোনো কিছুই দেওয়া আব্বুর পক্ষে সম্ভব হবে না। আমার যাবতীয় খরচ আমাকেই ম্যানেজ করতে হবে। সেটার কী করব?

– আরে কী কস? আমি তো ভার্সিটির ফার্স্ট ইয়ার থেকেই আমার নিজের খরচ নিজে চালাই। শুধু আমি না। আমার চারপাশের মোটামুটি ৯০% পোলাপান নিজের পকেট খরচ নিজে চালায়। সো, ইনকাম করা নিয়ে চিন্তা করার কিছু নাই। ইনকাম করে ফেলতে পারবি। হয়তো প্রথমবার ইনকাম করতে একটু কষ্ট হবে। তবে আমি কয়েকটা রাস্তা বলে দিব। তার মধ্যে যেকোনো একটা রাস্তা ফলো করলেই তুই সহজেই ইনকাম শুরু করে দিতে পারবি।

ভার্সিটি লাইফে ইনকাম করার কথা চিন্তা করতে গেলে তোর কাছে পাঁচ টাইপের অপশন আছে।

কোনো বাড়তি স্কিল ছাড়াই ইনকাম

তুই যদি বাংলায় কথা বলতে পারস। তাহলেই আর বেশি কিছুই লাগবে না। বইমেলা, বাণিজ্য মেলা, ট্যাক্স মেলা, ট্যুর মেলা, ফার্নিচার মেলা, বিবাহ মেলা, গামছা মেলা, চিমটি মেলা, কুতকুত মেলা। এ রকম একটার পর একটা মেলা লেগেই থাকে। তুই জাস্ট তিন দিন সময় নিয়ে একটা মেলাকে টার্গেট করবি। সেই মেলার সব স্টলে গিয়ে গিয়ে তাদের জানা, তুই সেলস রিপ্রেজেন্টেটিভ হতে আগ্রহী। তারপর তোর ফোন নম্বরটা তাদের দিয়ে আয়। প্রথম দিন যে স্টলগুলাতে গিয়েছিলি, দ্বিতীয় দিনও তাদের কাছে যাবি। এভাবে তৃতীয় দিন গেলে কোনো না কোনো স্টল তোকে ঠিকই হায়ার করে ফেলবে।

এ ছাড়া জাস্ট কথা বলা দিয়ে তুই বিভিন্ন কোচিং সেন্টারে পরীক্ষার গার্ড হতে পারবি। অনেক কল সেন্টার আছে সেগুলাতে কাস্টমার সার্ভিস রিপ্রেজেন্টেটিভ হতে পারবি।

বাংলা লিখতে পারলেও ইনকাম করার অপশনের অভাব নাই। ইংরেজি বিভিন্ন নিউজ পোর্টালের খবর বাংলায় ট্রান্সলেট করে ইনকাম করতে পারবি। বিভিন্ন কোম্পানির জন্য তাদের ওয়েবসাইটে ব্লগ লিখতে পারবি। বিভিন্ন কোম্পানির সোশ্যাল মিডিয়া পেইজের জন্য পোস্ট লিখতে পারবি। পত্রিকা বা নিউজ পেপারে লিখতে পারবি। আরও ভালো লিখতে পারলে অনেক বইয়ের প্রকাশনা আছে যারা ইংরেজি বইয়ের বাংলা অনুবাদ করে। সেই কাজগুলা করতে পারবি। সো, বাংলা লিখতে পারলে কাজের অভাব নাই।

আর তুই যদি ইংরেজিতে কথা বলতে পারস, তাহলে তো কেল্লা ফতে। ইন্টারন্যাশনাল কারও পার্সোনাল অ্যাসিস্ট্যান্ট হয়ে যেতে পারবি। ইংরেজিতে অডিও বুক বানাতে পারবি। ইংরেজিতে যেসব মেলা হয়। শেরাটন বা ওয়েস্টিন হোটেলে, সেগুলাতে সেলস পারসন হিসেবে সুযোগ পেলে প্রচুর ইনকাম করতে পারবি। ইংরেজি আর্টিকেল লিখতে পারলে বিভিন্ন ফ্রিল্যান্সিং সাইটে কনটেন্টে রাইটিংয়ের কাজ করতে পারবি। ইউটিউব ভিডিওর ট্রান্সক্রিপ্ট লিখে দেওয়ার কাজ করতে পারবি। সো, কাজের অভাব হবে না।

পড়াশোনা দিয়ে ইনকাম

স্টুডেন্ট লাইফে ইনকাম করার সবচেয়ে সহজ ও কমন উপায় হচ্ছে টিউশনি করা। পারলে ইন্টারমিডিয়েটের স্টুডেন্ট পড়াবি। না পারলে নাইন-টেন বা আরও নিচের ক্লাসের স্টুডেন্টদের পড়াতে পারস। চাইলে কোচিং সেন্টারে ক্লাস নিতে পারবি। ফ্যাকাল্টিদের কাছে অনেক রিসার্চ বা ডেটা কালেকশনের কাজ আসে, সেগুলা করতে পারবি। নোট বানিয়ে সেটা জুনিয়র বা স্কুল-কলেজের পোলাপানদের কাছে বিক্রি করেও ইনকাম করতে পারোবি। আরও কত-কী!

স্কিল ডেভেলপ করে ইনকাম

তোর কাছে যদি ছয় মাস থেকে এক বছর সময় থাকে। তাহলে [illegible] এসব তুই ছোটখাটো একটা স্কিল ডেভেলপ কর। সেটা হতে পারে ফটোগ্রাফি, গ্রাফিক ডিজাইন, ওয়েব ডেভেলপমেন্ট, অ্যাপ ডেভেলপমেন্ট, ডিজিটাল মার্কেটিং, ভিডিও এডিটিং, প্রেজেন্টেশন তৈরি, এনিমেশন, থ্রিডি মডেল, কার্টুন আঁকা। এ রকম কোনো একটা স্কিল ডেভেলপ করবি। তারপর এই টাইপের কাজ তোর সোশ্যাল মিডিয়ায় পাবলিশ করবি। করতে করতে তোর স্কিল বাড়বে এবং একসময় দেখবি তোর সেই সব কাজের জন্যই লোকজন নক দিচ্ছে। তখন সেই কাজ করেই তুই টাকা কামাইতে পারবি।

স্টার্টআপ বা বিজনেস করে ইনকাম

তুই যে ক্যাম্পাসে থাকবি। তার আশপাশে হাজার হাজার স্টুডেন্ট থাকবে। এই হাজার হাজার স্টুডেন্ট থাকার মানে কিন্তু হাজার হাজার কাস্টমার তোর আশপাশে আছে। এদের সবারই কিছু না কিছু জিনিসের প্রয়োজন হয়। যেমন ধর, কোনো একটা ইভেন্টের জন্য টি-শার্ট দরকার। অ্যাসাইনমেন্ট জমা দেওয়ার জন্য প্রিন্ট করা দরকার। ইভেন্টের জন্য পোস্টার ডিজাইন করা। ইভেন্টে খাবার সাপ্লাই দেওয়া। এ ছাড়া এরা সবাই বইখাতা কিনে। মোবাইল কিনে। কম্পিউটার কিনে। জামাকাপড় কিনে। চিন্তা করে দেখছস এইখানে কত-কী বিজনেস করার উপায় আছে?

কেউ যদি বিজনেস করতে চায় তাকে যে ক্যাম্পাসে বিজনেস করতে হবে এমন কোনো কথা নাই; বরং ক্যাম্পাসের বাইরের কাস্টমারদের জন্যও বিজনেস শুরু করতে পারবি। বিজনেস স্টার্ট করার মোক্ষম সময় হচ্ছে স্টুডেন্ট লাইফ। কারণ তখন তোর খরচ কম। বাবা-মাকেও টাকা দিতে হচ্ছে না। যার সঙ্গে ইটিশপিটিশ চলছে, সে-ও খোঁচা দিচ্ছে না।

স্মার্ট বা ক্রিয়েটিভ উপায়ে আর্নিং

বিজনেস কম্পিটিশন করে টাকা কামানো যায়। জাস্ট বছরে দুটি কম্পিটিশন করলে ভালো শো-অফ হয়। টাকা কামানোও হয়। এ ছাড়া ভিডিও গেমসের কম্পিটিশন। ভিডিও গেমসের স্ট্রিমিং, ইউটিউবিং করে অনেকেই ভালো ইনকাম করে। আরেকটু স্মার্টলি ইনকাম করতে চাইলে এফিলিয়েট মার্কেটিং (কমিশন বেইজড সেলস রিপ্রেজেন্টেটিভ) হতে পারস। তা ছাড়া পেইড প্রোডাক্ট রিভিউ, ড্রপ শিপিং, বিভিন্ন কোম্পানির ক্যাম্পাস ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর হয়েও টাকা কামানো যায়।

কীভাবে শুরু করব?

তবে যেভাবেই টাকা কামাতে যাস না কেন। অন্য কেউ এসে তোকে গিলিয়ে খাইয়ে দিবে না। প্রথম দিনই কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা উড়ে এসে উতরে পড়বে না। তাই তোকে বিভিন্ন জিনিস বিভিন্নভাবে খুঁজে বের করতে হবে। মানুষের কাছে ধরনা দিতে হবে। অনেকেই হেল্প করবে না। না করে দিবে। চাইলে তোকে একটা কানেকশন দিয়ে দিতে পারে। কিন্তু দিবে না। এসব ক্ষেত্রে তোর নিজে গিয়ে গিয়ে বের করতে হবে। লেগে থাকতে হবে। একভাবে না হলে অন্যভাবে ট্রাই করতে হবে। তাহলে একটা না একটা রাস্তা অবশ্যই খুলে যাবে।

আর সব সময় একটু চোখ-কান খোলা রাখবি। দেখবি তোর আশপাশের যারা আছে তারা কীভাবে টাকা কামাই করতেছে। তুই আর কিছু না পারলেও ওদের মতো করে শুরু করে দিবি। তাহলেই তোর টাকা কমানোর রাস্তা খুলে যাবে। তাতে তোর সিন্দুক, তোর বাবার সিন্দুক, তোর দাদির সিন্দুক সব সিন্দুক ভরে যাবে।

তুই কি জানস তোর নেক্সট কয়েক মাসের মেইন গোল কী? কোন একটা জিনিসে তুই ভালো করতে চাস? কোন জিনিসটা তুই তোর মেইন ফোকাসে রাখছস? তোর ড্রিমের জন্য এই সপ্তাহে কী কী করছস? সেটার একটা লিস্ট লিখে দে। তাহলে বোঝা যাবে তুই কি সত্যিই তোর ড্রিম এচিভ করার জন্য কাজ করে যাচ্ছস। নাকি হুদাই কল্পনা করে করে সময় নষ্ট করে যাচ্ছস?

তোর উত্তর–

১.

২.

৩.

ইনডিসিশনের চিপায় পড়ে মগজ হলে খণ্ড

শাবাবের আবির্ভাব।

শুধু শাবাব না। আরও শত শত নতুন স্টুডেন্টের আবির্ভাব। নতুন ব্যাচের ওরিয়েন্টেশন উপলক্ষে হাজার হাজার নতুন স্টুডেন্ট ক্যাম্পাসে চলে আসছে। এক একজন দেখতে একেক রকম। একেকজনের নাম একেক রকমের। একেকজনের বাড়ি একেক জায়গায়।

শাবাব যে ডিপার্টমেন্টের সেই ডিপার্টমেন্টের আরও দুজন বলছে তাদের সঙ্গে একই মেসে উঠতে। ডিপার্টমেন্টের এক সিনিয়র ভাই বলছে ব্যাচমেটদের সঙ্গে মেসে না উঠতে। আবার এক মেসে বলছে, সিঙ্গেল রুমে উঠলে সাত হাজার টাকা আর শেয়ারে উঠলে পাঁচ হাজার টাকা। সো, এখন সে কোন রুমে উঠবে? সকালের নাশতা নাকি মেস থেকে দিবে না। সো, সকালে কী খাবে? নতুন বই কিনবে নাকি পুরান বই কিনবে? ব্যাচের পোলাপান সবার সঙ্গে পরিচিত হওয়ার জন্য বিকেলে একটা রেস্টুরেন্টে যেতে বলছে। এখন সে কী সেখানে যাবে? গেলে কত টাকা খরচ হবে? এইরকম ডজন ডজন সিদ্ধান্ত, অনুসিদ্ধান্ত, উপসিদ্ধান্ত, অপসিদ্ধান্ত নিয়ে প্যাঁচে পড়ে তার শান্ত মন অশান্ত হয়ে দিগভ্রান্ত হয়ে গেছে। পুরাই দিশাহারা নিশাহারা অবস্থা হয়ে গেছে।

এই সব কনফিউশন নিয়ে সে ফোন দিছে তার ফুফাতো ভাই তামিম ভাইকে। তামিম ভাই জাহাঙ্গীরনগর ইউনিভার্সিটিতে সমাজকল্যাণ ডিপার্টমেন্টে পড়ে। শাবাবের সব কথা শুনে তামিম ভাই বলল,

তোর এত সব কনসার্নকে আমি বলি হুদাই কনসার্ন বা আজাইরা কনফিউশন। দেখ, যেগুলা নিয়ে তুই কনসার্নড সেগুলার কোনোটাই কি তোর লাইফ শেষ করে দিবে বা সারা জীবনের জন্য ইম্প্যাক্ট ফেলবে? মোটেও না। এইগুলা দুই-একটা সিদ্ধান্ত ভুল হলেও টেনশনের কিছু নাই। এক মাস বা দুই মাস পরে চেইঞ্জ করা যাবে। তাই এইগুলা নিয়ে ওরিড হবি না। জাস্ট আমার মতো করে ওয়াও ওয়াও করতে করতে ওয়ান-ওয়ান-ওয়ান ফর্মুলা অ্যাপ্লাই করে দিবি। তাহলেই হবে—

সিদ্ধান্ত নেওয়া খুবই সিম্পল। জাস্ট চিন্তা করে দেখবি ডিসিশনের ইমপ্যাক্ট কতটুকু। সেটার ইমপ্যাক্ট কত দিন থাকবে? বা সিরিয়াসনেস কতটুকু বা ডিসিশন ভুল হলে এইটার জন্য আফসোস কত দিন থাকবে। লস কী হবে? অথবা ডিসিশন যদি চেইঞ্জ করা লাগে। সেটা কি চেইঞ্জ করা যাবে? নাকি করা যাবে না। তাহলে সিদ্ধান্ত নেওয়া অনেক সহজ হবে।

মেগা ডিসিশন

ধর, কেউ একজন একাধিক ভার্সিটিতে চান্স পাইছে, এখন সে কোন ভার্সিটিতে যাবে বা একজন একাধিক সাবজেক্টে চান্স পাইছে, এখন সে কোন সাবজেক্টে পড়বে? একাধিক বফ বা গফের অপশন আছে। এখন কার সঙ্গে ঝুলে পড়বে? ক্যারিয়ারে এক সেক্টর থেকে আরেক সেক্টরে সুইচ করবে কি না? হায়ার স্টাডি করতে যাবে নাকি দেশেই থাকবে? বিসিএসে ঝাঁপিয়ে পড়বে নাকি প্রাইভেট সেক্টরে চেষ্টা করবে। ডিফেন্সে যাবে নাকি ভার্সিটিতে যাবে। ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে যাবে নাকি এইচএসসি দিয়ে ভার্সিটিতে যাবে।

এই সব জিনিসের ইমপ্যাক্ট লাইফে চার-পাঁচ বছর থাকে। তাই এই সব জিনিস নিয়ে প্রথম তিন দিন যত পারবি মানুষের সঙ্গে ডিসকাস করবি। ইন্টারনেটে ঘাঁটাঘাঁটি করবি। ইনফরমেশন কালেক্ট করবি। দরকার হলে কিছু মানুষের সঙ্গে দেখা করে ডিসকাস করবি। তাদের ওপিনিয়ন নিবি। সর্বোচ্চ এক সপ্তাহের মধ্যে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলবি।

আর মনে রাখবি, আল্টিমেটলি লাইফে কোন জিনিস ভালো হবে আর কোন জিনিস খারাপ হবে, সেই গ্যারান্টি দুনিয়ার কোনো মানুষই দিতে পারবে না। সো, তুই সঠিক সিদ্ধান্ত নিচ্ছস, নাকি ভুল সিদ্ধান্ত নিচ্ছস, সেটা মেইন ফ্যাক্টর না। ফ্যাক্টর হচ্ছে, তুই যেই সিদ্ধান্ত নিচ্ছস, সেই অনুসারে হার্ডওয়ার্ক করতেছস কি না। সেটার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করতেছস কি না। সেটাতে ফোকাসড থাকতেছস কি না। তাহলে ভুল সিদ্ধান্ত থেকেও ভালো কিছু চলে আসবে। কারণ

সিদ্ধান্ত তোকে কিছু দিবে না। যা পাবি তার সবই আসলে সিদ্ধান্ত নেওয়ার পরের চেষ্টা, সাধনা আর ভাগ্যের সহায়তা নিয়ে।

মেজর ডিসিশন

অনেক সময় লাইফে ছোটখাটো বা মাঝারি সাইজের কিছু ডিসিশন নিতে হয়। যেমন ধর, পাইথন শিখব, নাকি জাভাস্ক্রিপ্ট শিখব? এই স্যারের কাছে প্রাইভেট পড়ব, নাকি কোচিং করব? এই ব্যাংকে অ্যাকাউন্ট খুলব, নাকি ওই ব্যাংকে? পড়াশোনার পাশাপাশি টিউশনি করব, নাকি ইন্টার্ন খুঁজব?

এই সব জিনিসের ইমপ্যাক্ট লাইফে দুই-এক বছরের বেশি থাকে না। সহজেই চাইলে সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করা যায়। তাই এইগুলা নিয়ে এক দিনের বেশি একদম চিন্তা করবি না। দরকার হলে তিন ঘণ্টা সময় নিয়ে কয়েকজনের সঙ্গে কথা বল। ইন্টারনেটে ঘাঁটাঘাঁটি কর। তারপর সিদ্ধান্ত নিয়ে এগোতে থাক। মাঝপথে গিয়ে ভালো ফিল না করলে আবার একদিন সময় নিয়ে চিন্তা করে টুক করে চেইঞ্জ করে ফেলবি। কোনো ব্যাপারই না।

মাইনর ডিসিশন

অনেকেই আছে অকাজের জিনিসগুলা নিয়ে সারা দিন চিন্তা আর চিন্তা করতেই থাকে। চিন্তা করতে করতে লাইফ কান্তা পান্তা শান্তা বানিয়ে ফেলে। যেমন ধর, পরীক্ষা চলে আসছে এখন– এই সাবজেক্ট নিয়ে পড়তে শুরু করব, নাকি ওই সাবজেক্ট দিয়ে। অমুকরে ট্রিট দিব, নাকি তার ফ্রেন্ডকে? এই রেস্টুরেন্টে খাব, নাকি ওই রেস্টুরেন্টে বা আমি এই পিকনিকে যাব, নাকি যাব না। এই জামা পরব, নাকি ওই জামা। এই নাশতা খাব, নাকি ওই নাশতা। এইসব জিনিস নিয়ে এক মিনিটের মধ্যে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলতে হবে। সর্বোচ্চ এক ঘণ্টা সময় নষ্ট করতে পারস। তার বেশি না। আজাইরা জিনিস নিয়ে একদম টাইম ওয়েস্ট করতে যাবি না।

মোটমাট কথা হচ্ছে— পারফেক্ট ডিসিশন তুই বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই নিতে পারবি না। অর্থাৎ বেশির ভাগ ডিসিশনই খারাপ হবে। এর মধ্যে দুই-চারটা ডিসিশন ভালো হয়ে যাবে। এই দুই-চারটা ডিসিশনের আউটকাম দিয়ে তোর বাকি ভুল ডিসিশনগুলার ক্ষতি কড়ায়-গণ্ডায় উশুল হয়ে এমন পরিমাণ লাভ হবে যে ওভারঅল আফসোসই থাকবে না। আর অন্যদিকে কনফিউশন নিয়ে দিনের পর দিন, রাতের পর রাত, মাসের পর মাস বসে থাকলে— ১০০% লস ছাড়া কাজের কাজ কিছুই হবে না।

তাই আজকের পর থেকে লাইফে মেগা ইমপ্যাক্ট করে এমন কোনো কিছু নিয়ে এক সপ্তাহের বেশি কনফিউজড থাকা যাবে না। ইম্পর্ট্যান্ট কোনো কিছু নিয়ে এক দিনের বেশি কনফিউজড থাকা যাবে না। আর খুচরাখাচরা কোনো কিছু নিয়ে এক ঘণ্টার বেশি টাইম ওয়েস্ট করবি না।

এক সপ্তাহ, এক দিন, এক ঘণ্টা অর্থাৎ ১-১-১ পলিসিতে ডিসিশন নিতে শুরু করলে লাইফ ইজি হয়ে যাবে।

> In any moment of decision, the best thing you can do is the right thing, the next best thing is the wrong thing, and the worst thing you can do is nothing. –Theodore Roosevelt

প্যারা আছে ভাইয়া। বুঝতে পারছি তবে চারপাশে এত এত অপশন। কোনটা রেখে কোনটা ধরি। আপনি কী বলেন? আপনিও কি অনেক অপশন দেখে কনফিউশনে পড়ে যান? তারপর কীভাবে বোঝেন কোন অপশনটা আপনার জন্য ভালো বা কোন লাইনে গেলে ভালো হবে। সেটা কীভাবে বোঝেন?

– শোন, কখনো মিষ্টি কিনতে দেখছস? আঙুর কিনতে দেখছস? কমলা কিনতে দেখছস? দেখবি কেনার আগে দুই-চারটা খেয়ে দেখে। এতে যাচাই করাও হয়ে যায়। আবার ফাও ফাও কয়েকটা খাওয়াও হয়ে যায়। সবাই এই জিনিসটাকে নরমালভাবে নেয়। কিন্তু আমি একটাকে বলি চালাক সিস্টেম। ভার্সিটি লাইফের শুরুতে আমি যখন ফার্স্ট ইয়ারে ছিলাম, তখন আমি এই সিস্টেম অ্যাপ্লাই করছি। এই সিস্টেম অনুসারেই–

শুধু ভার্সিটি লাইফ না; বরং লাইফের যেকোনো জায়গায় চোখ-কান খোলা রেখে হালকা একটু 'চালাক'চতুর না হলে কিছুই করতে পারবি না। এখন তুই যদি চালাক শব্দটার দিকে খেয়াল করস, তাহলে দেখতে পাবি–

চেখে দেখো

'চালাক' শব্দটার প্রথম অক্ষর হচ্ছে 'চ'। এই 'চ' দিয়ে বোঝায় তোর সামনে ইন্টারেস্টিং কিছু এলে সেটাকে 'চেখে' দেখতে হবে। কারণ তোর চারপাশে অনেক অনেক অপরচুনিটি আসবে। কখনো কখনো দেখবি তোর ফ্রেন্ডরা ডিজিটাল কিছু একটা করতেছে। ফটোগ্রাফি, ইউটিউব, অনলাইন প্ল্যাটফর্মে লেখালেখি, পার্টটাইম চাকরি, প্রোগ্রামিং শেখা, বিজনেস কম্পিটিশন, রোবটিকস, অলিম্পিয়াড, অনলাইন সার্টিফিকেট কোর্স, গ্রাফিক ডিজাইন ইত্যাদি।

তোর ফ্রেন্ডরা করার মানে হচ্ছে, তোর চারপাশ থেকে তোকে খোঁচা দিচ্ছে– এই জিনিসগুলা কুল। এই জিনিসগুলা ইন্টারেস্টিং। এখন তুই যদি এই জিনিসগুলা চেখে না দেখস, তাহলে কিন্তু ওই জিনিসটার

[illegible] তোর নিজেরও কিছু একটা হওয়ার যে চান্স ছিল, সেটা কোনো [illegible] হবে না। অথচ তুই একটু আগ্রহী হয়ে হালকা একটু চেখে দেখলে তোর মজা লেগেও যেতে পারে। তারপর আস্তে আস্তে তুইও জিনিসটার ভিতরে ঢুকে যেতে পারবি। তুইও হয়তো একটা মেডেল, একটা সার্টিফিকেট, একটা ইন্টার্ন, কিছু ইনকাম করার সুযোগ পেয়ে তোর ক্যারিয়ার ডেভেলপ করার নতুন একটা রাস্তা পেয়ে যেতেও পারবি।

তুই যদি দর্শক হয়ে গ্যালারিতে বসে থাকস। কিউরিসিটি জেনারেট না করে সাইডলাইনে বসে থাকস। তাহলে কিন্তু তোকে আজীবন দর্শক হিসেবে, ওই দ্বাদশতম প্লেয়ার হিসেবেই সাইডলাইনে বসে থাকতে হবে। আর যদি দ্বাদশতম প্লেয়ার হিসেবে থাকতে না চাস, তাহলে তোকে চেখে দেখতে হবে। পানিতে নামতে হবে। মধু খেতে হলে মধুর কাছে যাইতে হবে।

তাই আজকের পর থেকে তোর যদি কোনো কিছু ইন্টারেস্টিং মনে হয়। কুল লাগে। নিজের ভিতরে কিউরিসিটি জাগাবি। একটা দিন ফিক্স করে ফেলবি। যেদিন তুই শুধু একটা স্পেসিফিক জিনিস চেখে দেখবি। বড়সড় কোনো কাজ হলে সেটার জন্য এক সপ্তাহ ফিক্স করে ফেলবি। হয়তো ঈদের এই বন্ধতে বা পূজার এই ছুটিতে বা পরীক্ষার শেষের এই বন্ধে বা নেক্সট তিন দিন আমি এই জিনিসটা দেখে ফেলব। দেখবই দেখব; যা আছে কপালে। এইরকম ডিটারমাইন্ড হয়ে। একটা টার্গেট আর একটা টাইমব্লক সেট করে ঝাঁপিয়ে পড়লে— তোর চেখে দেখার কাজ শুরু হয়ে যাবে।

লেগে থাকো

চালাকের সেকেন্ড অক্ষর হচ্ছে 'ল'। 'ল' মানে হচ্ছে তোকে লেগে থাকতে হবে। কারণ তুই দুনিয়ায় যেটাই করতে চাস না কেন ওটার জন্য তোর সামনে বাধা আসবেই আসবে। তুই রিসোর্সগুলা খুঁজে পাবি না। প্রোপার গাইডলাইন পাবি না। কোথায় গিয়ে কী করতে হয়, কোন জায়গায় কাকে ধরলে কী হয় বুঝবি না। কেউ তোকে গিলায়

গিলায় খাওয়ায় দিবে না; বরং সেটার জন্য তোকে বিভিন্ন দরজায় ধাক্কা দিতে হবে। বিভিন্ন জনের কাছে ধরনা দিতে হবে। কেউ একজন একবার না করে দিলেও কাঁচুমাচু করে আবার রিকোয়েস্ট করতে হবে। দরকার হলে তার কিছু কাজ করে দিয়ে হলেও তার পিছনে কাঁঠালের আঠার মতো লেগে থাকতে হবে। জায়গামতো দুই-একবার ছেঁচড়ামি করার দরকার হলে, হালকা একটু ছেঁচড়ামি করে ফেলবি। কী আছে জীবনে।

যেমন ধর, তুই যেকোনো একটা অনলাইন নিউজ পোর্টালের কন্ট্রিবিউটর বা লেখক হতে চাস। সেটার জন্য তুই হয়তো প্রথমে একটা অনলাইন পোর্টালকে নক দিলি। তারা রিপ্লাই দিল না। তুই কি এখন ছেড়ে দিবি? নাকি আরও দশটাকে নক দিবি? ধর, দশজনকে নক দেওয়ার পরও কেউ রিপ্লাই দিল না। তাহলে কি তুই ছেড়ে দিবি? স্বপ্নকে পলিথিনে মুড়িয়ে ডাস্টবিনে ফেলে দিবি? ছেড়ে দিবি?

ছেড়ে দিলে কিন্তু তোর লেগে থাকা হইল না; বরং তোর উদ্দেশ্য হবে এইটার শেষ দেখে নেওয়া। শেষ চ্যাপ্টার না দেখার আগ পর্যন্ত লেগে থাকা। তাই লেগে থাকতে হলে দেখতে হবে। সেই পোর্টালের ওয়েবসাইট ঘাঁটতে হবে। সেখানে কারা কারা আছে তাদের খুঁজে বের করতে হবে। কাদের লেখা পাবলিশ হয়েছে তাদের নাম, ফেসবুক, লিংকডইন, ইনস্টাগ্রাম যেখানে পাবি সেখানে খুঁজে বের করার চেষ্টা করবি।

মেসেজ দিবি। রিপ্লাই না পেলে তাদের পোস্টের নিচে প্রতিদিন একটা কমেন্ট করবি— আপনাকে একটা ইনবক্স করছি। তাতেও কাজ না হলে মিউচুয়াল ফ্রেন্ড কে আছে বা সে কোন গ্রুপের সদস্য, সেখানে সে অ্যাকটিভ আছে কি না, দেখবি বা সে কোন এলাকায় থাকে। অথবা সে কোন ভার্সিটির স্টুডেন্ট ছিল। সেখান থেকে লিংক ধরে কাউকে বের করা যায় কি না। এইভাবে অপশনের পর অপশন ট্রাই করার মানেই হচ্ছে তুই লেগে আছস।
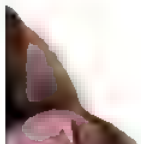
আর চালাক শব্দটার লাস্ট যে অক্ষর সেটা হচ্ছে 'ক'। এই 'ক' দিয়ে বোঝায় তোকে কামাই করতে হবে। কারণ যা-ই করস না কেন। সেটা লেখালেখি, বিজনেস, গান, ফটোগ্রাফি, প্রোগ্রামিং, ওয়েব ডেভেলপমেন্ট, লোগো ডিজাইন, ফ্রিল্যান্সিং, মার্কেটিং, ম্যানুফ্যাকচারিং, সেলস, আর্ট, ইঞ্জিনিয়ারিং— যেটাই করস না কেন, সেটা দিয়ে কামাই করতে হবে। হয়তো প্রথম প্রথম বেশি কামাতে পারবি না।

তারপরও অল্প হলেও কামাই করতে হবে। হয়তো তোর কাজের দাম পাঁচ হাজার টাকা। কিন্তু প্রথম প্রথম তুই নিজেও কনফিডেন্ট না। তাই হয়তো বলবি আপনি দুই হাজার টাকা দেন, আমি স্যাম্পল হিসেবে করে দিচ্ছি বা তুই ফটোগ্রাফি শিখতেছস। প্রথম প্রথম ক্লায়েন্ট ধরার জন্য বিশাল ডিসকাউন্ট দিলি বা কয়েকজনকে ফ্রি ফ্রি ভালো কাজ করে দিলি যাতে তারা অন্যদের কাছে তোর নাম রেফার করে।

অর্থাৎ অল্প হলেও তুই যা শিখছস, তুই যা পারস সেটা দিয়ে কিছু না কিছু কামাই করার চেষ্টা করবি। কেউ তোর স্কিল বা কাজের জন্য টাকা দিতে রাজি হওয়াটা তোর জন্য একটা কনফার্মেশন যে তোর স্কিল ভালো। তোর কোয়ালিটি ভালো। এ ছাড়া কিছু টাকা পেলে সেই টাকা দিয়ে তুই অ্যাডভান্স লেভেলে যাওয়ার জন্য জিনিসপত্র কিনতে পারবি। ফ্যামিলি সাপোর্ট করতে পারবি। অল্প কিছু কামাই করতে পারলে তোর নিজেরও ভালো লাগবে। তোর কনফিডেন্সও বাড়বে।

তাই আজকের পর থেকে কোনো কিছু শেখার ক্ষেত্রে হোক, ক্যারিয়ার ডেভেলপের ক্ষেত্রে হোক অথবা তোর প্যাশনটাকেই আইডেন্টিফাই করার ক্ষেত্রে হোক। তুই এই চালাক থিওরিটা অ্যাপ্লাই করবি অর্থাৎ ইন্টারেস্টিং কোনো কিছু দেখলে দুই-তিন দিন বা এক সপ্তাহ চেখে দেখবি। ভালো লাগলে সেটার পিছনে লম্বা একটা সময় লেগে থাকবি। এরপর সেটা দিয়ে অল্প হলেও কিছু না কিছু কামাই করার চেষ্টা করবি। তাইলে তোর ক্যারিয়ারের, তোর ফিউচারের, তোর প্যাশনের নতুন একটা রাস্তা তৈরি হবে।

সিক্রেট পাইয়া খুশির ঠেলায় বগল বাজায় জাদু

ফুফুর কাছে শুনছি। আপনি নাকি ডিপার্টমেন্টের ফার্স্ট। পত্রিকায় নিয়মিত লেখালেখি করেন। আবার কোচিং সেন্টারেও ক্লাস নিচ্ছেন। এত কিছু কীভাবে ম্যানেজ করেন? আপনার সিক্রেট কী? ফর্মুলা কী?

– আরে, ফর্মুলা-টর্মুলা কিছুই না। জাস্ট কয়েকটা জিনিস খেয়াল রাখবি। আর কিছুই না।

লাইফের বিভিন্ন সময় আমাদের বিভিন্ন জায়গায় যেতে হয়। একসময় স্কুল থেকে কলেজে, কলেজ থেকে ভার্সিটিতে, ভার্সিটি থেকে চাকরিতে, কিংবা হায়ার স্টাডির জন্য এক দেশ থেকে সম্পূর্ণ অন্য দেশে যেতে হয়। এসব নতুন পরিবেশে তুই যদি ভালো করতে চাস, তাহলে এই সাতটা সিক্রেট তোকে অবশ্যই অ্যাপ্লাই করতে হবে।

কে বন্ধু আর কে সিন্ধু

প্রথমেই তোকে আইডেন্টিফাই করতে হবে কে বন্ধু আর কে শত্রু। কলেজ বা ভার্সিটিতে অনেক সময় দেখবি, কেউ কেউ খুব স্মার্টনেস দেখাচ্ছে বা ড্যাম কেয়ার ভাব দেখাচ্ছে। তাদের চক্করে গেলে কিন্তু তুই লাইন থেকে বেলাইনে ফেঁসে যাবি। তাই তোকে একটু সিনসিয়ারলি খেয়াল করতে হবে, কে তোকে ভালো পথে নিতে চাচ্ছে আর কে খারাপ পথে নিতে চাচ্ছে।

এ ছাড়া তুই ডিফারেন্ট টাইপের পারসোনালিটিওয়ালা মানুষ দেখবি। এদের সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিতে হবে। কেউ হয়তো খুবই স্ট্রিক্ট। আবার কেউ হয়তো খুবই ফ্রেন্ডলিভাব নিয়ে জায়গামতো ঠিকই বাঁশ দিচ্ছে। তাই এ রকম ডিফারেন্টটাইপের মানুষদের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার মেন্টালিটি ওপেন রাখতে হবে।

লার্ন অ্যান্ড এক্সপ্লোর টু বিকাম অ্যান এক্সপার্ট

তুই যে জায়গায়ই যাস না কেন, তোকে কিছু কিছু জিনিস ডেফিনেটলি শিখতে হবে। ওই এনভায়রনমেন্টে যারা ভালো পারফর্ম করছে,

তোদের অনেক অনেক প্রশ্ন করবি। কীভাবে কী করতেছে জানতে মানুষ কেউ হয়তো তোকে ঠিক উত্তর দিবে। আবার কেউ হয়তো তোকে ঘোরাবে। যারা ঘোরাবে তারা কিন্তু তোর ফ্রেন্ড না, তারা ফাউল ক্যাটাগরির। তাদের থেকে আস্তে আস্তে দূরে সরে যাবি।

অলস মতলব OLLS

নতুন এনভায়রনমেন্টে গেলে বা নতুন একটা মিটিংয়ে বসলে সবার আগে সব চিল্লায়-ফাটায় ফেলার দরকার নাই; বরং অবজার্ভ (Observe) কর। কে কী বলছে, কীভাবে বলছে, অন্যরা কীভাবে রেসপন্স করছে। তাদের ইন্টারঅ্যাকশনটা কী হচ্ছে, সিচুয়েশনটা কী. সেই জিনিসগুলা অবজার্ভ কর। এরপর মনোযোগ দিয়ে শুনবি (Listen). শুনে ওটাকে অ্যানালাইসিস করার চেষ্টা করবি। তারপর শেখার (Learn) চেষ্টা করবি। হয়তো বাসায় এসে আরেকটু এক্সপ্লোর করে দেখলি। এরপর সবার শেষে দরকার হলে কথা বলবি (Speak)।

প্রথমে অবজার্ভ করবি। তারপর লিসেন করবি। এরপর লার্ন করবি। তারপর স্পিক করবি। অর্থাৎ তুই OLLS (Observe Listen Learn Speak) বা অলস ফর্মুলা ইউজ করবি।

ম্যানেজ ইউর সেলফ টু ম্যানেজ ইউর লাইফ

তুই যখন নতুন একটা জায়গায় যাবি, তোর লাইফের আগের যে সিমেট্রি ছিল, আগের যে ইকুয়েলিব্রিয়াম ছিল, সেটা নষ্ট হয়ে যাবে। ধর, তুই কলেজ থেকে ভার্সিটিতে গেলি, এখন তোর নিজের ইনকাম করা লাগতে পারে। নিজেই নিজের জামাকাপড় ধুইতে হবে। অপরিচিত মানুষের সঙ্গে থাকতে হবে। ডিফারেন্টটাইপের খাওয়া খাবি। এমন আরও অনেক নতুন জিনিস, অনেক নতুন রেসপন্সিবিলিটিও চলে আসবে।

সো, সব সময় তোকে ওভারঅল কী কী টাস্ক আছে। কী করতে হবে। কাজের পাশাপাশি এনজয় করার জন্য ফ্রেন্ডশিপ, ঘোরাফেরা, পরীক্ষা, আড্ডা এবং এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাকটিভিটিজের সঙ্গে

কিছুটা যোগাযোগ রাখতে হবে। অর্থাৎ তোকে লাইফটাকে ব্যালান্স রাখতে হবে।

ম্যানেজ ইমোশন, ম্যানেজ ফেইলিউর

তুই একটা জায়গায় যখন যাবি তোর শরীরের সঙ্গে সঙ্গে তোর ইমোশনও থাকবে। এই ইমোশনগুলা নানাভাবে তোকে ইনফ্লুয়েন্স করবে। কখনো হতাশ হবি, কখনো প্রেমে পড়বি, কখনো বাঁশ খাবি আবার কখনো ভয় পাবি। এই সিচুয়েশনগুলা তোকে হ্যান্ডেল করতে হবে।

মাঝেমধ্যে তোর দু-একজনের সঙ্গে ইটিশপিটিশ শুরু হয়ে কিছু একটা হয়ে যাওয়ার উপলক্ষও চলে আসতে পারে। সেই ক্ষেত্রে গদগদ হয়ে জানপ্রাণ সঁপে দেওয়ার আগে তোকে বুঝতে হবে। কার সঙ্গে দিচ্ছি, কতটুকু দিচ্ছি। হয়তো কিছুদিন পরে ওই নদীর স্রোত অন্য কারও হৃদয়ে চলে যেতে পারে। কত কিছুই হতে পারে। এইরকম সব সিচুয়েশন হ্যান্ডেল করার জন্য তোর একটা মেন্টাল স্ট্রেংথ থাকতে হবে।

বাস্তব দুনিয়ায় মাঝেমধ্যে তুই কিছুটা পিছিয়ে যাবি। অনেক সময় অন্য কেউ তোর মুখের খাবার কেড়ে নিবে। বিনা কারণে তোকে ঠকাবে। অপমান করবে। জীবনে চলার পথে এমন অনেক কিছুই হবে। সবকিছু হজম করে উঠে দাঁড়ানোর মাইন্ডসেট তোকে আগে থেকেই রাখতে হবে। কিছুটা হজম করবি। কিছুটা মেনে নিবি আর কিছুটা অ্যানালাইসিস করবি এবং তোর করণীয় কিছু থাকলে সেটা করবি। না হয় সব ভুলে যাবি।

এক্সট্রা জিনিস এক্সট্রা না

স্কুল, কলেজ, ভার্সিটি সবখানেই দেখবি মেইন কাজের পাশাপাশি এক্সট্রা কিছু জিনিস আছে। কলেজ বা ভার্সিটিতে এগুলাকে বলে, এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাকটিভিটিজ। এগুলা থাকার দরকার কী? নিঃসন্দেহে তোর মেইন কাজ পড়ালেখা করা, সেটা তুই অবশ্যই
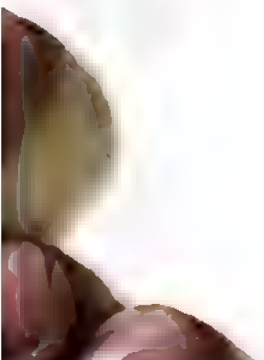
করবি। এর বাইরে তুই যদি এই একস্ট্রা কারিকুলার অ্যাকটিভিটিজে যুক্ত থাকস, তাহলে কাকে কীভাবে হ্যান্ডেল করতে হবে। কাকে কাজ দিলে করবে আর কাকে কাজ দিলে সে উল্টা দিকে দৌড় দিবে, তা আরও ভালোভাবে ধরতে পারবি।

শুধু এটাই না, মাঝেমধ্যে বন্ধুদের সঙ্গে ঘুরতে যাওয়া বা ট্যুরে যাওয়া, একটু রিফ্রেশ হওয়ার বিষয় থাকবে। কিন্তু ব্যাপারটা এমন যেন না হয় যে প্রতি মাসে তুই তিন-চারবার ট্যুরে চলে যাচ্ছস। দ্যাটস এক্সট্রিম। এই এক্সট্রিমের দিকে যাওয়া যাবে না। এনজয় করার জন্য বা ব্রেক নেওয়ার জন্য তুই হয়তো বছরে দুই-একটা ট্যুর দিতে পারস। কিছু মুভি দেখতে পারস। অথবা সপ্তাহে দুই-চার ঘণ্টা আড্ডা দিতে পারস। নিজেকে কন্ট্রোলে রেখে।

নাথিং ইজ অ্যাবসলিউটলি নেসেসারি

এই জিনিসটা লাইফের সব স্টেজে সব সময় মনে রাখবি। দুনিয়ায় এমন কিছু নাই যেটা ছাড়া তোর চলবে না। তুই ভাবতে পারস, জিপিএ ৫, অঢেল টাকা-পয়সা, সার্টিফিকেটস না হলে, ইংরেজি না পারলে, সূর্য না উঠলে লাইফে কিছুই করতে পারবি না। তবে এইগুলা মোটামুটি কমন হলেও ১০০% সত্যি না। কারণ দুনিয়ায় অ্যাবসলিউটলি নেসেসারি বলতে কিছু নাই।

তুই যদি সলিড থাকস, অনেস্ট থাকস, হার্ডওয়ার্ক করস; তাহলে তুই যদি দুই-চারবার খারাপ করস। দ্যাট ডাজেন্ট ম্যাটার। তুই পরের লেভেলে গিয়ে ঠিকই উঠে দাঁড়াতে পারবি।

নম্বর থ্রি বাম্বু– আইক্কাওয়ালা বাম্বু

এই বম্বু কাজে লাগাতে হলে তোর পকেটে যত টাকা আছে সেটা তোর বড় ভাই বা আপুকে দিয়ে বলতে হবে, আমি এই কাজটা অত দিনের মধ্যে করে দেখাতে পারলে আমার টাকাগুলা ফেরত দিবে। না হয় দিবে না। অথবা এই চ্যাপ্টারের সব অঙ্ক ফিনিশ করতে না পারলে তোর মোবাইল ফোনটা তোর আব্বুকে দিয়ে দিবি। দেখবি এমন আইক্কাওয়ালা বাম্বুর জন্য–তোর কাজ শুধু ফিনিশ হবে না; বরং দৌড়াবে।

কারণ মানুষ হিসেবে আমরা শক্তের ভক্ত নরমের যম। আমরা ঠেকায় পড়লে, ঠেলায় পড়লে, ডলা খাইলে, ঠিকই সব করে ফেলতে পারি। কারণ ঠেলার নাম বাবাজি। অথচ রেগুলার সময়ে ভালোয় ভালোয় কিছু করতে বললে আমরা ঢিলামি করি। আর বাম্বু দিলে ঠিকই স্যার স্যার বলি।
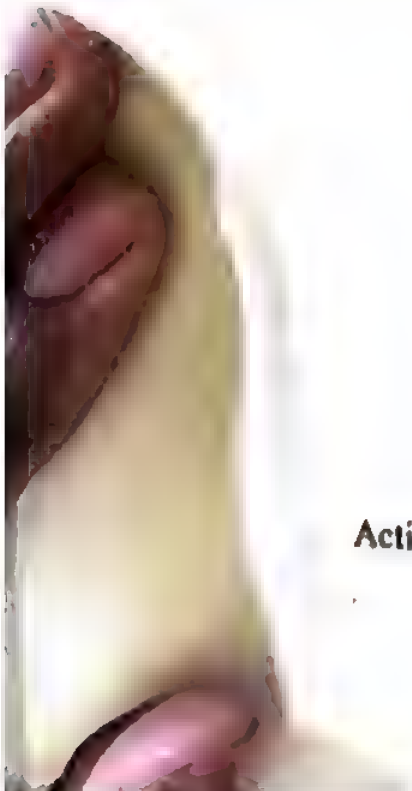
Action may not always bring happiness; but there is no happiness without action. –Benjamin Disraeli

তোর যেসব কাজ করা লাগে সেজন্য তুই কি তোর টাইম ভালোভাবে ম্যানেজ করস? নিজেই নিজেকেই ডেডলাইন দেস। নিজে নিজেই কি চেক করস তোর কাজটা শেষ হইছে কি না? যদি করে থাকস তাহলে নিচে লিখে দে গত এক মাসের মধ্যে কোন কোন কাজ ফিনিশ করার জন্য তুই নিজে নিজেকে ডেডলাইন দিছিলি এবং ঠিক সময়ে ফিনিশ করছিলি।
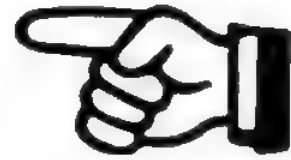
তোর উত্তর–

১.

২.

৩.

গুঁতা দিয়ে শ্রোতা খোঁজে, না পেয়ে পাত্তা

ধীরে ধীরে শাবাবের প্রাদুর্ভাব সব জায়গায় দেখা যাচ্ছে। একটু একটু করে খোলস থেকে বের হয়ে আসার চেষ্টা করতেছে সে। বিভিন্ন জনের কাছে হেল্প চাওয়া শুরু করতেছে। ইউটিউব, ফেসবুক থেকে বিভিন্ন গাইডলাইন রিলেটেড ভিডিও খুঁজে বের করে। নিজেই নিজেকে গাইডলাইন দেওয়ার চেষ্টা করে। যাদের মতো হতে চায় তাদের ফলো করে। ফোকাস থাকার চেষ্টা করে। মাঝেমধ্যেই তার ফোন সাইলেন্ট করে চৌকির নিচে রেখে দেয়। যাতে কোনো নোটিফিকেশন এসে তাকে ডিসট্রাক্ট করতে না পারে।

নিজেকে একটু গুছিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করতেছে। সেটার জন্য সে ভাবতেছে। ক্যাম্পাসে একটু ভালো করবে। একটু অ্যাটেনশন বা পাত্তা পাবে। সেই জন্য সে কিছু ভিডিও খুঁজে বের করল। কয়েকটা সেলফ হেল্প রিলেটেড বই পড়ল। তারপর ফাহিম সৌরভ ভাইয়ের একটা ভিডিও খুঁজে বের করল। সেখানে ভাইয়া গুছিয়ে বলেছেন কীভাবে পাত্তা পাওয়া যায়। সেই ভিডিওতে ভাইয়া বলেছেন—

পাত্তা বা অ্যাটেনশন পেতে চাইলে তোমাকে প্রথমেই অ্যাটেনশন পাওয়ার যোগ্য হতে হবে। চিন্তা করে দেখো, তোমার সামনে যদি এক শটা বিল্ডিং থাকে তুমি কি একসঙ্গে ওই এক শ বিল্ডিংয়ে চোখ রাখতে পারবে? না, পারবে না; বরং যে বিল্ডিংটা সবচেয়ে উঁচু বা সবচেয়ে বড় বা যে বিল্ডিংটা সবচেয়ে স্পেশাল, সেটার দিকেই তোমার চোখ যাবে। সেটাতেই তোমার অ্যাটেনশন যাবে।

এখন একটু চিন্তা করে দেখো— তোমার ফ্রেন্ড সার্কেলে, তুমি কোনো একটা অ্যাঙ্গেলে পাত্তা পাওয়ার যোগ্য হইছ কি না? এটা হতে পারে পড়ালেখার দিক দিয়ে। হতে পারে যেকোনো প্রকার স্কিলের দিক দিয়ে। অথবা হতে পারে তুমি ভালো গল্প করতে পারো বা স্মার্টলি কথা বলতে পারো। এইরকম কোনো একটা অ্যাঙ্গেল-ট্যাঙ্গেল আছে কি না? যেটা দিয়ে তুমি পাত্তা পাওয়ার যোগ্য হতে পারো? যদি থাকে তাহলে অন্যরা তোমাকে পাত্তা দিবে। নচেৎ পাত্তা দিবে না।

ধরো, তোমার কাছে স্পেশাল কিছু নাই। তাহলে কী করবে?

লুক আউটসাইড

আশপাশে তাকিয়ে দেখো। কাকে অন্যরা সবাই পাত্তা দিচ্ছে। সে কে? তাকে কেন সবাই পাত্তা দিচ্ছে? সে কি কোনো কিছু ভালো পারে? বা সে স্পেশাল কিছু করতে পারে? এইরকম আরও কয়েকজনের একটা লিস্ট বানিয়ে ফেলো। যাদের তুমি নিজেও একটু-আধটু পাত্তা দাও।

লুক ইনসাইড

এইবার নিজের দিকে তাকাও। একটু চিন্তা করে দেখো তোমার ভিতরে এমন কিছু আছে, যেটা তুমি ভালো পারো বা যেটা নিয়ে তুমি অনেক বেশি ইন্টারেস্টেড। তাহলে সেটা দিয়ে কিছু একটা করে ফেলার চেষ্টা করো। তাহলে অন্যরা তোমাকে পাত্তা দিবে। সেইরকম কিছু খুঁজে বের করতে পারলে তোমার অর্ধেক সমস্যা সমাধান হয়ে যাবে।

আর স্পেশাল কিছু খুঁজে না পেলে, এমন একজনকে টার্গেট করো এবং সে যা যা করতেছে, সেগুলাকে তুমি হুবহু কপি করা শুরু করে দাও।

টেক ইউর টাইম

হুট করে সবাই তোমাকে পাত্তা দেওয়া শুরু করবে না। তবে একটা কিছু করে ফেলতে পারলে, সেটা চেইঞ্জ হয়ে যাবে। ধরো, তুমি একটা বিজনেস কম্পিটিশন জিতে গেছ বা কোনো একটা বিজনেস শুরু করছ বা একটা বই লিখে ফেলছ বা পত্রিকায় তোমার লেখা ছাপা হয়। তাহলে কিন্তু লোকজন তোমাকে পাত্তা দিবে। তবে এই পাত্তা পাওয়ার আগে কিছু হোমওয়ার্ক করতে হবে। হয়তো পত্রিকায় লেখা ছাপা হওয়ার আগে বেশ কয়েকবার লেখা পাঠাতে হবে। বিভিন্ন মানুষের কাছে ধরনা দিতে হবে। অনেক ঘোরাবে। তারপর লেগে থাকলে একদিন হয়ে যাবে।

হাঁটি হাঁটি পাত্তা

তুমি ছোট। তাই তুমি যদি কোনো একটা ইভেন্টে যাও। কেউই তোমাকে পাত্তা দিবে না। তো, সেখানে পাত্তা পাওয়ার জন্য ওইখানে কিছু কাজ করা শুরু করে দাও। হয়তো স্টেজে কয়েকজন চেয়ার আনার চেষ্টা করতেছে। তুমিও সেই কাজ করা শুরু করে দাও। অনুমতি চাওয়ার কিছু নাই। জাস্ট শুরু করে দাও। হেল্প করো। কিছুক্ষণ পর ওরাই তোমার পরিচয় জানতে চাইবে। এইভাবে ওইখানে তুমি রেগুলার হেল্প করতে থাকলে তারা সবাই তোমাকে চিনতে শুরু করবে। কয়দিন পর ওদের ওইখানে কোনো কমিটি হওয়ার সময়, তোমাকে কমিটিতে পজিশন দিবে এবং তুমি পজিশন পেয়ে গেলে পজিশন বা পদবির জোরে নতুন পোলাপানরা অবশ্যই তোমাকে পাত্তা দেওয়া শুরু করবে।

ওয়ার্ম ইন্ট্রোডাকশন

বেশির ভাগ সময় দেখা যায়, প্রেমের প্রপোজ করার জন্য প্রেমিক প্রথমে গিয়ে কথা বলে না। অন্য আরেকজন বা তার বন্ধু গিয়ে বলে, অমুক তো হেব্বি জিনিয়াস, অনেক স্মার্ট। সবাই তার পিছনে ঘোরে। অর্থাৎ তার সম্পর্কে অনেক ভালো কথা বলে প্রেমের জন্য রাজি করানোর চেষ্টা করে। এই জিনিসটাকে বলে ওয়ার্ম ইন্ট্রোডাকশন।

এটা শুধু প্রেমের ক্ষেত্রে না, বিজনেস, নেটওয়ার্কিং বা ডিল পাওয়ার জন্য, টিউশনি বা পার্টটাইম চাকরি পাওয়ার সময় অনেক বেশি ইউজ করা যায়। কিছুই না। একজনকে খুঁজে বের করবা, সে গিয়ে তোমার সম্পর্কে ভালো ভালো কথা বলে মাঠ গরম করে দিবে। তারপর তুমি গিয়ে হালকা শরম শরম ভাব নিয়ে গরম গরম কাজ সেরে ফেলবা।

কোল্ড ইন্ট্রোডাকশন

অনেক সময় দেখা যায় যে তোমাকে ইন্ট্রোডিউস করার কেউ নেই বা তুমি যে মহান কিছু করে ফেলছ, এই কথা জানান দেওয়ার কেউ নেই। এই ক্ষেত্রে তোমার নিজের ঢোল নিজেকেই পিটাতে হবে।

চোখ বন্ধ করে এক লাইন বা দুই লাইনে নিজের শানশওকত বলতে থাকবা। সেই রকম কিছু বলতে পারলে তোমাকে কিছুটা হলেও পাত্তা দিতে পারে।

তবে পাত্তা পাওয়া মেইন উদ্দেশ্য না। উদ্দেশ্য হচ্ছে পাত্তা পাওয়ার অসিলায় তুমি কিছু একটা জিনিস ভালোভাবে করতে শুরু করবা। নিজেকে নতুন একটা লেভেলে নিয়ে যাবা। তারপর পাত্তা পাইলে পাবা। না পাইলে নাই। শ্রোতা না পাইলে নাই। গান গাইতে থাকো। গাইতে গাইতে তোমার গানের কোয়ালিটি বাড়বে। শ্রোতাও জমবে।

মাঞ্জামারা দিনগুলা সব, হয়ে যাচ্ছে ভর্তা

নিজের লাইফকে আরেকটু অর্গানাইজড করতে গিয়ে শাবাব আরও কিছু প্রোডাকটিভিটি রিলেটেড, পড়ালেখা রিলেটেড ইউটিউব ভিডিও খুঁজে বের করে। তাদের মধ্যে একটা ভিডিওতে পেয়ে গেল। যেটা তার লাইফের সঙ্গে মিলে গেছে। সেই ভিডিওতে বলছে–

চোখ বন্ধ করে কানামাছি খেলতে পারবা। কিন্তু ফুটবল, ক্রিকেট কিংবা কুতকুত খেলতে পারবা না। সেই কারণেই বিশাল একটা খোলা মাঠে তোমাকে চোখ বন্ধ করে নামিয়ে দিয়ে যদি বলি– গোল দাও। তুমি গোল দিতে পারবা না। গোলপোস্ট আদৌ আছে কি নাই, সেটাই তুমি জানো না বা চোখে দেখো নাই। তাই তুমি চাইলেও গোল দিতে পারবা না।

এই অজানা গোলপোস্টের মতো– তোমার লাইফের প্রতিটা দিনই তোমার কাছে লক্ষ্যহীন। সকালে বিছানা থেকে ওঠার আগেই তুমি জানো না আজকে তোমার কী কাজ? আজকে কী করতে হবে? কী করলে আজকের সারাটা দিন তোমার জন্য ফলপ্রসূ হবে? আজকের দিনে কোন কাজটা ফিনিশ করতে পারলে তুমি খুশি হবে? সেটা যদি জানো তাহলে সেটা করা তোমার জন্য অনেক ইজিয়ার হবে। আর যদি না জানো তাহলে তোমার দিনটা ইউটিউব আর ফেসবুকে খেয়ে দিবে।

তবে সহজ কথাটা হচ্ছে– গোলপোস্ট ঠিক করতে সময় লাগে এক মিনিট। জাস্ট এক মিনিট সময় নিয়ে ঠিক করে ফেলো আজকে তুমি কী করবে। বেশি না। জাস্ট একটা মেইন কাজ রাখো। এর বাইরে অন্য কিছু থাকলে থাকবে। না থাকলে নাই। তবে মেইন কাজ সেট করবা জাস্ট একটা। আর সেটা ঠিক করতে সময় লাগবে এক মিনিট। এই এক মিনিটের মধ্যে ৩০ সেকেন্ড লাগবে চিন্তা করতে। আর ৩০ সেকেন্ড লাগবে যেই গোল সেট করছ, সেটা একটা কাগজে লিখে রাখতে।

চেষ্টা করবা প্রতিদিন রাতে ঘুমানোর আগে এক মিনিট সময় নিয়ে চেক করতে, যে কাজ করতে চাইছিলা সেটা করতে পারছ কি না? যদি করতে পারো তাহলে নিজে নিজে মুচকি একটা হাসি দিয়ে দিবা। দেখবা সেই হাসির স্যাটিসফেকশন তোমার সারা দিনের জড়তা, ক্লান্তি এক মুহূর্তেই খতম করে দিছে।

আর যদি কোনো কারণে কোনো এক দিনের কাজ ফিনিশ করতে না পারো। তাহলে জাস্ট পরের দিন সেই কাজটা ফিনিশ করার টার্গেট সেট করবা। তবে কোনো একটা কাজ টানা দুই দিনের বেশি টানা যাবে না। অর্থাৎ এক দিনের কাজ পরের দিন গেলে সেই দিনের মধ্যে ফিনিশ করতে হবে। যদি ফিনিশ করতে না পারো, তাহলে বাথরুমে গিয়ে দশবার কানে ধরে ওঠবস করবা। ইয়েস, কানে ধরে ওঠবস করবা। গুনে গুনে। যাতে কোনো কারণে ফিউচারে তোমার এক দিনের কাজ আরেক দিন চলে না যায়।

এই সিম্পল জিনিসটাই, এই সিম্পল মাইন্ডসেটটাই তোমার গোলপোস্ট রেডি করে দিবে। তুমি জানবে কোথায় গোল দিতে হবে। কোন দিকে গোল দিতে হবে।

তবে সব সময় খালি মাঠে গোল দিতে পারবা না; বরং মাঝেমধ্যে প্রতিপক্ষের ১১ জন প্লেয়ারের মতো তোমার সামনে এসে দাঁড়াবে ফেসবুক, ইউটিউব, মোবাইল ফোনের নোটিফিকেশন, নিউজ, পাশের বাসার জানালার পিছনের কেউ।

এই সব প্রতিপক্ষকে পাশ কাটিয়ে লক্ষ্যের দিকে চোখ রেখে তুমি যদি সারা দিনের চার ঘণ্টা সময়ও দিতে পারো, তাহলে দিন শেষে প্রাণখোলা ক্লোজআপমার্কা হাসি তুমিই দিতে পারবে।

আর্জেন্ট কাজের দোহাই দিয়ে ফাঁপর মারে সার্জেন্ট

শাবাবের ক্লাসমেটরা প্রায়ই তাকে তেতানোর চেষ্টা করে। সিরিয়াস শাবাব বলে টিটকারি মারে। যদিও শাবাব চেষ্টা করে ইগনোর করতে। কিন্তু সব সময় পারে না; বিশেষ করে তার কোনো ফ্রেন্ড যখন আসে, তখন তাদের সামনে টিটকারি করলে শাবাবের খুব খারাপ লাগে। কিন্তু কী করবে সেটা সে বুঝে উঠছে না।

এরপর একদিন হুট করে দেখল ফাহিম সৌরভ ভাই একটা ভিডিও দিয়েছেন ঘষা থিওরি নামে। সেই ভিডিওতে ফাহিম ভাই বলেছেন—

ঘষা শব্দটাকে ইংরেজিতে বলে 'ফ্রিকশন'। যারা ফিজিকস পড়ে তারা জানে— যেই সারফেসে ফ্রিকশন বেশি থাকবে, সেই সারফেসে কোনো একটা জিনিস যতটা দ্রুত সামনে যেতে পারত, সে ততটা দ্রুত সামনে যেতে পারবে না। বরং ঘর্ষণের জন্য স্লো হয়ে যাবে।

এইবার চিন্তা করে দেখো—সারা দিনে তোমার সবচেয়ে বেশি সময় কাটে কাদের সঙ্গে? হয় চারপাশে যেসব ফ্রেন্ড আছে তাদের সঙ্গে নতুবা অনলাইনে যাদের সঙ্গে কথা হয়। অর্থাৎ যারা তোমার ফ্রেন্ড তাদের সঙ্গেই তোমার ঘেষ্টাঘেষ্টি বেশি হয়।

এখন আরেকবার চিন্তা করে দেখো— তুমি যেটা করতে চাও? তুমি যে রকম হতে চাও? তোমার যে ড্রিম, সেই টাইপের ড্রিম নিয়ে তোমার চারপাশের ফ্রেন্ডরা সিরিয়াস কি না। নাকি ওরা সারাক্ষণ মুভি মুভি মুভি নিয়ে হাউকাউ করে। ওয়েব সিরিজে নতুন কী আসছে, রাতের বেলার ফুটবল খেলায় কে বেশি গোল দিচ্ছে। কে কাকে রোস্ট করেছে, সেগুলা নিয়ে পড়ে থাকে। যদি ওদের সঙ্গে তোমার লাইফের গোল, তোমার মিশন, তোমার ড্রিম সিমিলার না হয়, তাহলে ওদের সঙ্গে তোমার ফ্রিকশন হবে। এই ফ্রিকশনে তোমার সামনে এগোনোর গতি কমে যাবে। তোমার চারপাশের ফ্রেন্ডরা যেসব জিনিস নিয়ে আলোচনা করে, সেটাই সারা দিন তোমার মাথার ভিতর টুথ টুথ টুথ টুথ করবে।

ধরো, তুমি ভালো ডিজাইনার হতে চাও আর তোমার ফ্রেন্ডরা অলরেডি ভালো ডিজাইনার বা তুমি প্রোগ্রামার হতে চাও আর তোমার ফ্রেন্ডরা ভালো প্রোগ্রামার। অথবা তুমি ভালো গায়ক হতে চাও আর তোমার ফ্রেন্ডরা অলরেডি স্টেজ শো করতেছে। তাহলে ওদের সঙ্গে চলার কারণে দুই-একটা স্টেজ শো তুমিও মাঝেমধ্যে পেয়ে যাবে।

সিমিলার ফ্রেন্ডদের ফ্লো থেকে তোমার কিছু না কিছু একটা লাভ হবে। হেল্প লাগলে, হেল্প পাবে। সিমিলার জিনিস নিয়ে সারা দিন আলোচনা হবে। ডাইরেক্টলি বা ইনডাইরেক্টলি অনেক জিনিস দেখে ফেলবে, জেনে ফেলবে এবং ওদের যেসব কানেকশন, সেগুলা থেকেও তুমি বেনিফিটেড হবে।

আর যদি তুমি হতে চাও সায়েন্টিস্ট আর তোমার ফ্রেন্ডরা ফুটবল খেলোয়াড়। তাদের সারা দিন খেলা নিয়ে কাটে। এমনকি তোমার ফ্রেন্ডরা যদি ক্যারিয়ার নিয়ে চিন্তা না করে, স্কিল ডেভেলপমেন্টের পিছনে টাইম না দেয়, নিজেদের থিংকিংটাকে পজিটিভ রাখার চেষ্টা না করে সব সময় মাস্তি আর আড্ডা নিয়ে পড়ে থাকে, তাহলে ওদের ঘর্ষণে, ভুল বর্ষণে, দূরদর্শনে তুমি ফড়ফড় করে পিছিয়ে যাবে।

চামে দিয়া কাম সারে কদু-মার্কা ডিটারজেন্ট

> ইউটিউব আরেকটা ভিডিও রিকমেন্ড করল, যেটার টাইটেল হচ্ছে সাইলেন্ট শত্রু। সেই ভিডিও দেখেই শাবাব ভাবল– সাইলেন্ট শত্রু আবার কী? আর ভিডিওতে ক্লিক করেই দেখতে লাগল। ভিডিওতে বলতেছে–
>
> সব সময় নিজের ভিতর থেকে একটা সাইলেন্ট কম্পিটিশন বা হিডেন কম্পিটিশন ফিল করবা। তাহলে একটা কম্পিটিটিভনেস এবং একটা চ্যালেঞ্জ তোমার ভিতরে আসবে। সেটা দিয়েই চামে চুমে এগিয়ে যাওয়ার কাম সারবা।

ধরো, তোমার ফ্রেন্ড সার্কেল বা আশপাশের কেউ একজন একটা কম্পিটিশনে জিতে গেল। ভালো একটা পার্টটাইম জব পেয়ে গেল। তিনটা অনলাইন কোর্স কমপ্লিট করে ফেলছে বা ভালো প্রোগ্রামিং শিখে ফেলেছে, অথবা গ্রাফিক ডিজাইন দিয়ে চমৎকার চমৎকার পোস্টার, ওয়েবসাইট ডিজাইন করে ফেলতেছে। এমনকি কয়েকজন মিলে বিজনেস স্টার্ট করে ফেলছে।

আর এই সব দেখে তোমার নিজের মধ্যে মনে হবেই– ইশ্, আমি কেন পারতেছি না, আমার কেন হচ্ছে না। তো এইরকম সিচুয়েশনে তুমি এই কয়টা কাজ করবা না।

দেখো শুধু আউটপুট, না মেপে ইনপুট

প্রথমেই আমরা একটা ভুল করি। আমরা আউটপুটকে কম্পেয়ার করি। ইনপুট বা এফোর্টকে কম্পেয়ার করি না। ধরো, তোমার ফ্রেন্ড ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকোতে চাকরি পেয়ে গেল বা গ্রামীণফোনে চাকরি পেয়ে গেল। অথবা বিদেশে হায়ার স্টাডি করতে টপ ইউনিভার্সিটিতে স্কলারশিপ পেয়ে গেল। আমরা সেই আউটপুটটা দেখি কিন্তু চিন্তা করে দেখি না যে এই আউটপুট পাওয়ার জন্য সে কতটুকু ইনপুট দিছে। কতটুকু এফোর্ট দিছে, কতটুকু হার্ডওয়ার্ক করছে। সেই হার্ডওয়ার্কটা

কি আমি করেছি? সেই লেভেলের বা তার চাইতে বেশি এফোর্ট কি আমি দিছি? তার মতো দিনের পর দিন লেগে থেকেছি?

তুমি যদি তার লেভেলের হার্ডওয়ার্ক না করে থাকো, তার পরিমাণ রাত জেগে জেগে ইংলিশ প্র্যাকটিস না করে থাকো, তাহলে তার মতো পজিশনে কীভাবে যাবা? তাই আজকের পর থেকে অন্য কারও আউটপুটের সঙ্গে তোমার আউটপুট কম্পেয়ার করতে যাবা না; বরং তার এফোর্ট আর তার ইনপুটের সঙ্গে তোমার এফোর্ট আর তোমার ইনপুটের কম্পেয়ার করবা। তাহলেই তোমার কী করা লাগবে, সেই উত্তর পেয়ে যাবা।

অন্যকে আন্ডার এস্টিমেট, ফাঁস হবে সিক্রেট

কখনোই অন্যের সাকসেসের নেগেটিভ কারণ বা ফাও অজুহাত খোঁজার চেষ্টা করবা না। কারণ অনেক সময় দেখা যায়, কেউ বিজনেসে ভালো করলে। তখন আমরা গিয়ে বলি, আহ্‌ ও তো নিশ্চয়ই টাকা মেরে দিছে। অথবা চালাকি করছে বা ওখান থেকে তো ফ্রি ফ্রি সুযোগ পেয়েছে বা কেউ একজন খেলায় ভালো করে ফেললে তার হার্ডওয়ার্ককে না দেখে উল্টা বলে বসি, ওর হাইট বেশি। তাই পারছে। অথচ ওর চাইতেই দুই ইঞ্চি বেশি হাইট নিয়ে তোমার পাশের বাসার আক্কাস যে গাবগাছ, তালগাছ হয়ে লাঠির মতো দাঁড়িয়ে আছে, সেটা দেখি না। আসলে–

> অন্যের সফলতার মধ্যে নেতিবাচক কারণ খুঁজে বের করার মানে হচ্ছে তোমার নিজের যে সামর্থ্য নাই, সেটাকে প্রকাশ করা
>
> আরেকজনের হার্ডওয়ার্ককে আন্ডারএস্টিমেট করার মানে, নিজের অ্যাবিলিটিকে কাজে না লাগানোর ফন্দি। নিজের আফসোস, নিজের না পারার কান্নাকে হাইড করার চেষ্টা। অন্যের অর্জন নিয়ে ব্যাকবাইটিং করার মানে, নিজের ভিতরে যে তেজ নাই, বারুদ নাই, সেই জারিজুরি ফাঁস করা।

সাইলেন্ট কপি, বাড়ায় এনট্রপি

তুমি যদি কম্পিটিটিভ হয়ে থাকো তাহলে দেখো ও কী কী করছে। আর তুমি কী কী করতেছ। অর্থাৎ তোমাদের দুইজনের এফোর্টের লেভেল সেইম কি না। সে যদি চার ঘণ্টা পড়ালেখা করে তুমি চার ঘণ্টা পড়তেছ কি না? সে এই এই জায়গায় কোচিং করতেছে, তুমিও সেই একই জায়গায় কোচিং করতেছ কি না। তাকে কিছু বলে দেওয়ার দরকার নাই। জাস্ট সাইলেন্টলি তাকে কপি করবা। সে যদি বুঝেও যায় তারপরেও তাকে কপি করবা।

তাই টার্গেট সেট করে একজনের সঙ্গে সাইলেন্ট কম্পেয়ার করা শুরু করে দাও। পজিটিভলি কম্পেয়ার করো। নিজের স্ট্রেংথ বাড়ানোর জন্য কম্পেয়ার করো। নিজের ভিতরে একটা জেদ আনার জন্য কম্পেয়ার করো। কম্পিটিটিভ অ্যাঙ্গেল থেকে কম্পারিজন করো। কম্পিটিটিভ অ্যাঙ্গেল থেকে হিংসা করো। তাহলে হিংসা করাটাও তোমাকে একটা এনার্জি দিবে। একটা ডায়নামিক নেচার দিবে। একটা স্পিরিট দিবে। একটা স্ট্রেংথ দিবে, যাতে তুমি সামনে আগায় যেতে পারো।

সব সময় খেয়াল রাখবা, দুনিয়ার খেলাটা একটা লংটার্ম খেলা। এক বা দুই দিনে কোনো কিছু হুট করে চেইঞ্জ হয়ে যাবে না। তবে লেগে থাকলে, চেষ্টার জোশ উঠলে, ইচ্ছার শক্তি থাকলে এক জায়গায় আটকে থাকবা না।

তুই কি ডেইলি ডেইলি কী কী করবি সেই গোল সেট করস? কোনো একটা কাগজে তোর ডেইলি গোল লিখে রাখস? তারপর চেক করে দেখস তোর ডেইলি গোলগুলা তুই এচিভ করতে পারছস কি না। যদি করে থাকস তাহলে লাস্ট তিন দিনের কী কী গোল ছিল সেটা নিচে লিখে দে। তাহলেই বোঝা যাবে তুই সিরিয়াসলি গোল সেট করস কি না।

তোর উত্তর–

১.

২.

৩.

মরা ইঞ্জিনে খরার মাসে উতলে উঠছে যৌবন

সেকেন্ড ইয়ার থেকে থার্ড ইয়ারে উঠে গেছে শাবাব। ধীরে ধীরে নিজেকে একজন হার্ডওয়ার্কিং পারসন হিসেবে তৈরি করার ট্রাই করতেছে। দুইটা অর্গানাইজেশনের কমিটিতে ঢুকে গেছে। ক্যাম্পাসের বিভিন্ন অ্যাকটিভিটিসে থাকছে। পরীক্ষার পরের গ্যাপে তিনটা অনলাইন কোর্স জোগাড় করে সেগুলা করে ফেলছে। একটু একটু করে প্রোগ্রামিং শিখছে।

দুই বছর আগের শাবাব এখন আর আগের মতো নাই। আগের শাবাবের মরা ইঞ্জিনে এখন ভরা যৌবন চলে আসছে। ক্যাম্পাসের অন্যরাও সেটা নোটিশ করতেছে। মাঝেমধ্যে তার ফ্রেন্ডরা এমনকি জুনিয়র পোলাপানরাও গাইডলাইন বা সাজেশনের জন্য আসে। এই তো আজকে দুপুরে শাবাবের রুমে আসছে তার ফ্রেন্ড নিয়াম। নিয়াম এসে কিছুক্ষণ গল্প করার পর জিজ্ঞেস করে,

—তুই নিজেকে লাইনে রাখস কীভাবে? আমি তো কোনো টিউটোরিয়াল দেখতে গেলে বা অল্প একটু ব্রেক নিতে গেলেই সেই দিন শেষ হয়ে যায়। তাই দিন শেষে প্রায়ই দেখা যায় সারা দিনে তেমন কোনো কিছুই করা হয়নি। এমন কেন হয়?

নিয়ামের প্রশ্ন শুনে শাবাব বলে উঠল—

যে মুহূর্তে তুই একা থাকস, সেই মুহূর্তে তুই কী করস— সেটা দিয়েই নির্ধারিত হয়, তুই লাইফে কী করবি আর কী না করবি। যে মুহূর্তে তোকে নির্দেশনা দেওয়ার কেউ নাই, সেই মুহূর্তে তুই নিজেকে কী নির্দেশনা দিচ্ছস— সেটা দিয়েই নির্ধারিত হয়, তুই সামনে এগোবি, নাকি পিছিয়ে পড়বি।

শোন, তোর লাইফের ড্রাইভিং ফোর্স, কন্ট্রোল সেন্টার হচ্ছস— তুই। এই মুহূর্তে তোর চিন্তাভাবনাকে অ্যাকসেস করতে পারে, একমাত্র তুই। এই মুহূর্তে তুই পড়বি, নাকি পড়বি না— সেটার ডিসিশন মেকার তুই। তোর মরা ইঞ্জিনে যৌবন আনার কাজ করবি নাকি বাঁশবনে লুকায় থাকবি— সেই ডিসিশন নিবি তুই।

শুধু এই মুহূর্তের জন্য না; বরং তোর লাইফের বেশির ভাগ মুহূর্তের ডিসিশন মেকার তুই। সো, একটু চিন্তা করে দেখ– তুই তোর নিজস্ব মুহূর্তগুলাতে কি নিজের সামর্থ্য নিয়ে সন্দেহ করে কাটিয়ে দিচ্ছস, নাকি নিজের অ্যাবিলিটি বাড়ানোর জন্য চেষ্টা করতেছস? নিজেকে কি পজিটিভ মোশন দিচ্ছস, নাকি লুজ মোশনে পিছলা খাচ্ছস?

একটু ভেবে দেখ। নেগেটিভ সেলফ টকগুলাকে পজিটিভে কনভার্ট করার চেষ্টা কর। 'ও তো পারবেই, ওর টুট টুট টুট আছে' না বলে, বল– 'ও যেহেতু পারছে, আমিও চেষ্টা করে দেখি।' 'আজকে মনে হয় হবে না' না বলে, বল– 'আজকে দরকার হলে এক ঘণ্টা পরে ঘুমিয়ে হলেও শেষ করব।' 'চারপাশের কেউ আমাকে হেল্প করে না' না বলে, বলবি– 'এরা কেউ হেল্প না করলেও, আমি নিজে নিজেই করব।'

নিজেই নিজেকে পজিটিভ অ্যাঙ্গেলে ড্রাইভ করার চেষ্টা করবি। নিজে নিজে টাস্ক সেট করে দিবি। নিজে নিজেকে ডেডলাইন দিয়ে দিবি। নিজে নিজে চেক করবি, ভেরিফাই করবি। কাজ ভালোমতো হয়েছে কি না। তাহলে নিজের লাইফের ড্রাইভিং সিটে তুই বসতে পারবি। তোর মরা ইঞ্জিনে ভরা যৌবন ফিরে পাবি।

Take time to deliberate; but when the time for action arrives, stop thinking and go in. –Andrew Jackson

নারে দোস। আমার মনে হয় আমার ব্রেন একটু বেশি ভোঁতা। ঘণ্টার পর ঘণ্টা কোনো একটা জিনিস নিয়ে পড়ে থাকলেও মাথার ঘিলুর মধ্যে কিছু ঢোকে না। সব মনে হয় মাথার এক শ হাত ওপর দিয়ে চলে যাচ্ছে। আর আমি যেই লাউ সেই কদু মধু চদু হয়েই আছি।

– হার্ডওয়ার্ক করার দরকার আছে। তবে হার্ডওয়ার্কের সঙ্গে সঙ্গে স্মার্টলি হার্ডওয়ার্ক করার দরকার আছে।

শোন, ইংরেজিতে কাছাকাছি দুইটা শব্দ আছে। একটা হচ্ছে– efficiency আরেকটা হচ্ছে effectiveness.

চিন্তা করে দেখ– একটা ছুরি দিয়ে যত পরিশ্রম করেই গাছ কাটতে থাকস না কেন, যতই ইফিশিয়েন্ট হোস না কেন, যতই হার্ডওয়ার্ক করস না কেন, গাছ কাটার জন্য একটা ছুরি কখনোই একটা 'কুড়াল'-এর মতো ইফেকটিভ হবে না। আবার একখান কুড়াল পেয়ে সারাটা জীবন সেই কুড়ালের পিছনে সঁপে দিলে, কুড়ালের চাইতে যে 'করাত' ইফেকটিভ, সেই বেনিফিট তোর আর পাওয়া হবে না। এমনকি করাতের চাইতে যে 'চেইন শ' আরও বেশি ইফেকটিভ সেটার খোঁজ না রাখলে, করাতওয়ালা হিসেবে হার্ডওয়ার্ক করেই যাবি, ঘাম ঝরাতেই থাকবি; মাগার ঘাম অনুসারে দাম আর পাবি না।

এই ইফিশিয়েন্সি আর ইফেকটিভনেসের খেলা দুনিয়ার সব জায়গায়ই আছে। যেমন রেগুলার ক্লাস করে নোট বানিয়ে যত মার্কস পায় একজন, তার কাছ থেকে সাজেশন নিয়ে, কিছু ইফেকটিভ টেকনিক খাটিয়ে মার্কস বেশি পায় অন্য আরেকজন। অফিসে গাধার মতো খেটে প্রোডাকশন টার্গেট ফুলফিল করে একজন। MBA করার জন্য অফিস থেকে ফান্ড পায় আরেকজন। এমনকি গদগদ করে চার বছর প্রেম করে একজন। বিদেশ থেকে দুই সপ্তাহের ছুটি নিয়ে দেশে এসে ঘটনা ঘটিয়ে ফুলের মধু খায় আরেকজন।

এটাই দুনিয়ার খেলা।

তাই, লাইফে যেটাই করবি। সেটার জন্য অবশ্যই ডেডিকেটেড হবি। হার্ডওয়ার্ক করবি। ইফিশিয়েন্ট হবি। তবে তার পাশাপাশি চোখ-কান খোলা রেখে কড়া ইফেকটিভ তাবিজের দিকে খেয়াল রাখবি। অন্য কেউ বেটার কোনো সিস্টেম দিয়ে চিমটি কেটে তোর ফিউচার কেড়ে নেওয়ার আগেই তোর ভাগের অংশ শক্ত করবি। জিদ্দি হয়ে বুদ্ধি অ্যাপ্লাই করবি।

তাহলেই তুই ইফিশিয়েন্ট হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ইফেকটিভ হয়ে উঠতে পারবি।

ধন-জৌলুস গায়েব হবে, হইয়া থাকলে বিন্দাস

[ফিহাম বলে উঠল]

কয়দিন আগে তুই হিডেন ফিডেন শুরু নামের একটা ভিডিওর দিকে দিছিলি না? ভিডিওটা ভাল্লাগছে ভায়া।

তবে আমার অন্য আরেকটা সমস্যা হচ্ছে ইদানীং। সেটা হচ্ছে দুইটা টিউশনি করে টাকা পাই। ক্যামনে ক্যামনে জানি টাকাগুলা সব বিন্দাস হয়ে যায়। কী করা যায় বল তো? তুই তোর টাকা কীভাবে ম্যানেজ করস?

– কিছুই না। জাস্ট পাঁচটা সিম্পল রুলস মাথায় রাখবি। আর কিছু করা লাগবে না। তার ধন দৌলত যা আছে তা তোর কাছেই থাকবে। কারণ,

টাকাপয়সা হচ্ছে আমাদের পশ্চাদ অংশের বায়ুর মতো। চান্স পাইলে শব্দ করে বা শব্দ না করে বের হয়ে যাবেই। মাঝেমধ্যে গন্ধ ছড়াবে। আবার মাঝেমধ্যে গন্ধ ছড়াবে না। কিন্তু সে পেটের মধ্যে গ্যাস হিসেবে থাকলে, বের হয়ে যাবেই যাবে। এ জন্য দেখা যায়, তোকে পাঁচ হাজার টাকা দিলেও অনেক কষ্টটষ্ট করে তোর মাস চলে যাইত। দশ হাজার দিলেও যাইত। আর এখন মাসে বিশ হাজার টাকা কামাই করার পরেও মাস শেষে তুই যেই ফকির, সেই ফকিরই থেকে যাস।

কারণ আমাদের চারপাশের সবাই অক্টোপাসের মতো ঘুঁটির দান বসায় রাখছে। সবার টার্গেট তোর পকেটের দিকে। টাকা আসলেই কামড়া কামড়ি, খামচা খামচি করে সব গায়েবুল হাওয়া করে দিবে। তাই টাকাপয়সা হারিয়ে বিন্দাস না হতে চাইলে নিচের টেকনিকগুলা অ্যাপ্লাই করবি।

টাচলেস মানি ইউ হ্যাভ

নম্বর ওয়ান রুল হচ্ছে তুই যাই আর্ন করস না কেন, সেটা তুই নিজে আর্ন করস বা ফ্যামিলির কাছ থেকে পকেট মানি হিসেবে পাস, তার টোয়েন্টি পার্সেন্ট মানি, মিনিমাম টোয়েন্টি পার্সেন্ট মানি আলাদা

একটা ব্যাংকে অ্যাকাউন্টে রেখে দিবি। আর তুই যদি সিঙ্গেল পারসন লব করস তাইলে তোর স্যালারির ফিফটি পার্সেন্ট মানি আলাদা একটা ব্যাংকে রেখে দিবি। এমন একটা ভাব যে ওই টাকাটার ব্যাংক অ্যাকাউন্ট বা ওইটার কোনো ক্রেডিট কার্ড তোর কাছে নাই। যাতে চাইলেও তুই ওই টাকাটা উঠায় নিতে পারবি না। ওই টাকাটা যদি তোর হাতের কাছে না থাকে তাহলে বাধ্য হয়ে যতটুকু টাকা আছে, অতটুকু টাকা দিয়ে কষ্ট করে হলেও ম্যানেজ করার চেষ্টা করবি।

ক্রেডিট কার্ড ডায়েটিং

ক্রেডিট কার্ড খুবই খতরনাক একটা জিনিস। ধর, তুই যদি দুই হাজার টাকা ক্যাশ নিয়ে শপিং করতে গেলি। এখন কিছু কিনতে হলে সর্বোচ্চ দুই হাজার টাকা দামের জিনিস কিনতে পারবি। কিন্তু তার চাইতে বেশি টাকার জিনিস কিনতে পারবি না। আর তুই যদি ক্রেডিট কার্ড নিয়ে শপিং করতে যাস। তোর ব্যাংকে দুই হাজার বা কম টাকা থাকলেও তুই দশ-পনেরো হাজার বা বিশ হাজার টাকার জিনিস কিনে ফেলতে পারবি। এমন না যে এই বাড়তি টাকাটা তোর জন্য ফ্রি। টাকা তোকে দিতেই হবে। মাফ নাই। এ জন্য ক্রেডিট কার্ড ব্যবহারকারীরা যদি নিজেদের কন্ট্রোল করতে না পারে, তাহলে আজীবন ক্রেডিট কার্ডের ধার শোধ করতে করতেই তাদের জীবন চলে যায়।

সো, তুই যদি ক্রেডিট কার্ডের ফ্রিকুয়েন্ট ইউজার হোস, মাঝেমধ্যে ক্রেডিট কার্ডটা বাসায় রেখে কিছু ক্যাশ টাকা উঠাইয়া তারপর যা। এই যে ক্যাশ টাকা উঠাইতে তোকে ব্যাংকে বা এটিএম বুথে যেতে হবে, এই কষ্টের কারণেও তুই অনেক সময় খরচ করতে যাবি না।

প্লে উইথ সাইকোলজি

বেশির ভাগ সময় মাসের শুরুতে বেতন পেলেই আমরা শপিং করতে, মোবাইল কিনতে এবং হাবিজাবি কিনতে চলে যাই। এইটা করা যাবে না। কারণ মাসের শুরুতে হাতে টাকা বেশি থাকে। তাই বেহিসেবি

খরচও বেশি হয়ে যায়। আর মাস শেষে টাকা নাই। পয়সা নাই। রুমের ভিতরে আলো নাই। আলোর মধ্যে ক্যালসিয়াম নাই বলে বলে কান্নাকাটি করে।

আজকের পর থেকে টাকা হাতে পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কোনো শপিং করতে যাবি না। বাড়তি কিছু কিনতে হলে মাসের লাস্ট সপ্তাহে যাবি। তখন হাতে অনেক কম টাকা থাকবে। চাইলেও বেশি খরচ করতে পারবি না।

বাই উইথ ডবল ক্যাপাসিটি

নতুন ফোন কেনার খায়েশ হইলে আমরা অনেক সময় কোনো রকমে টাকা ধারধুর করে ফোনটা কিনে ফেলি। এইটা করা যাবে না; বরং তুই কোনো একটা জিনিস কেনার জন্য তখনই ক্যাপাবল হবি, যখন ওই জিনিসটা কেনার পরেও সেই জিনিসটা যদি হারিয়ে যায় বা ছিনতাই হয়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে নগদ ক্যাশ টাকা দিয়ে তুই আরেকটা সেইম প্রোডাক্ট কিনে ফেলতে পারবি। সেই ক্যাপাসিটি যখন হবে, তখন তুই ওই জিনিসটা কেনার জন্য হচ্ছে যোগ্য হইলি।

তবে কখনো যদি কোনো একটা জিনিস না হলেই চলবে না কিংবা কেনার সঙ্গে সঙ্গে সেটা দিয়ে এক সপ্তাহের মধ্যে ইনকাম শুরু করা যাবে, তাহলে হিসাব আলাদা। সে ক্ষেত্রে তুই ধার করে কিছু কেনার কথা চিন্তা করতে পারস।

ইগনোর ডিসকাউন্ট ট্রাপ

ডিসকাউন্ট দিক আর কুপন দিক। সারা জীবন একটা কথা মনে রাখবি দুনিয়ার কেউই তোকে লসে প্রোডাক্ট দিবে না। সেটা সে থার্টি পার্সেন্ট ডিসকাউন্ট দিক। একটা কিনলে একটা ফ্রি দিক; বরং একটা ডিসকাউন্টের মুলা ঝুলিয়ে তোর যেই জিনিস কেনার দরকার ছিল না, সেটা তোকে দিয়ে কিনিয়ে নিল। তোর ভিতরে একটা আর্টিফিশিয়াল ডিমান্ড তৈরি করে। কিছু টাকা তোর পকেট থেকে তার পকেটে নিয়ে যাচ্ছে।

তাই আজকের পর থেকে কোনো ডিসকাউন্ট বা কোনো ডিল অনেক চমকপ্রদ হলেই সেটা কিনতে যাবি না; বরং চিন্তা করে দেখবি কোনো ডিল বা ডিসকাউন্ট না থাকলেও কি আমি এই জিনিসটা কিনতাম? এই প্রশ্নের উত্তর যদি হয় হাঁ, তাহলে বুঝতে পারবি তোর এই জিনিসটা লাগবে। তুই ডিসকাউন্টের ফাঁদে পড়িস নাই। আর যদি ডিসকাউন্ট দেখেই মনে হয় এই জিনিসটা ভালো বা কাজে লাগতে পারে বা ফিউচারে লাগতে পারে। এইটার মানে হচ্ছে তোর জিনিসটার দরকার নাই। তুই ডিসকাউন্টের ট্র্যাপে পড়ছস।

সব সময় একটা কথা মনে রাখবি। আমরা যেমন দাঁত থাকতে দাঁতের মর্ম বুঝি না। সেই একইভাবে টাকা থাকতে টাকা সেইভ করার মর্ম বুঝি না। তবে মর্ম একদিন ঠিকই বুঝবি। যখন দেখবি ইমার্জেন্সি সিচুয়েশন ট্যাকেল দেওয়ার জন্য যথেষ্ট টাকা ম্যানেজ করতে মানুষের দ্বারে দ্বারে হাত পাতা লাগতেছে। সেই দিনে পড়ার আগেই লাইনে চলে আয়।

কিন্তু দোস্ত, রেজাল্টটাকে তো লাইনে আনতে পারলাম না। অথচ তুই গত দুই সেমিস্টারে তো ফাটায় দিচ্ছস। আবার বিজনেস শুরু করছস। ডিবেটিং ক্লাবের সেক্রেটারি। চুপেচাপে মাইনকা চিপায় আর কত-কী যে করস, কে জানে। আর আমি দুইটা টিউশনি করেই পড়ালেখায় দেবদাস হয়ে বসে আছি। আমাকে কিছু একটা রাস্তা বের করে দে বন্ধু।

– ও, এই কথা। এই জন্য একটা চিকন কিছু বুদ্ধি আছে। দাঁড়া বলতেছি।

যাদের পড়তে ভাল্লাগে না। পড়তে মন চায় না। পড়তে ইচ্ছে করে না। কিংবা পড়ার টাইম ম্যানেজ করতে পারে না, তাদের জন্য খুবই আরামের একটা ট্রিকস আছে। আমি আরামের এই জিনিসটাকে বলি, REST ফর্মুলা। এই REST ফর্মুলাটা অ্যাপ্লাই করতে গিয়ে প্রথমেই REST-এর ভিতরের E-এর দিকে খেয়াল কর।

E দিয়ে Eleminate

এই E দিয়ে বোঝায় এলিমিনেট (Eliminate) করে ফেলা। তাই তোকে কিছু জিনিস এলিমিনেট করতে হবে। এখন তুই চিন্তা করে দেখ– সারা দিন না পড়লেও সারা দিনের সময়টা কোনো না কোনোভাবে পার হয়ে যায়। তো, এই সারা দিনের সময়টা তোর কোনো কোনো ফাও কাজে চলে যায়? মোবাইল টিপাটিপি করতে? ফেসবুক ঘাঁটাঘাঁটি করতে? ইউটিউবে স্ক্রলিং করতে? বন্ধুদের সঙ্গে চ্যাট করতে? নাকি ভিডিও গেমস, মুভি দেখার পিছনে। কিসের পিছনে যায়? সেটার ছোট খাটো একটা লিস্ট বের কর।

লিস্ট হয়ে যাওয়ার পর তোর একটা কাজ। সেটা হচ্ছে তোর এই লিস্টের সবচেয়ে বড় তিনটা কাজ করা বন্ধ করতে হবে। অর্থাৎ তুই যেসব কাজে সবচেয়ে বেশি সময় নষ্ট করস, সেগুলাকে এলিমিনেট করতে হবে।

তুই যদি মোবাইল খুব বেশি ইউজ করস তাইলে মোবাইলটা টার্ন অফ করে তোর আম্মুকে তিন দিনের জন্য দিয়ে দিবি বা তুই যদি কিছু না করে সারা দিন বিছানায় শুয়ে থাকস। তাহলে এই বিছানা, কাঁথা, বালিশ তোর রুম থেকে বের করে বারান্দায় বা তোর পাশের রুমে নিয়ে রেখে আসবি। অর্থাৎ যে কাজগুলা তোর সময় খেয়ে ফেলে, তুই তাদের খেয়ে ফেলবি।

S দিয়ে Specific

এই S দিয়ে বোঝায়— তোকে একটু স্পেসিফিক (Specific) হতে হবে। সেটা বেশি দিনের জন্য না বা পুরা দিনের জন্য না; বরং ছোট্ট একটা সময়ের জন্য। শর্ট একটা ডিউরেশনের জন্য। কখনো চিন্তা করবি না যে এই সপ্তাহ পড়ে ফাটাইয়া ফেলব বা আজকে সারা দিন শুধু পড়বই পড়ব। খাওয়া, বাথরুম কিছুই করব না। খালি পড়বই। এই সব চিন্তা করে কোনো লাভ নাই; বরং তুই চিন্তা করবি— আমি জাস্ট এক ঘণ্টা পড়ব। তার বেশি না।

আর খুব খায়েশ হলে— বড়জোর দেড় থেকে দুই ঘণ্টা। এর বেশি চিন্তাই করবি না। আর এই এক-দেড় ঘণ্টার মধ্যে দশটা সাবজেক্ট না। এমনকি একটা সাবজেক্টের সবকিছু না। শুধু সিম্পল, স্পেসিফিক একটা জিনিস ডিসাইড করবি। যেটা এক ঘণ্টার মধ্যে আমি শেষ করব। এক ঘণ্টার মধ্যে শেষ না হলে দেড় বা দুই ঘণ্টার মধ্যে শেষ করব। এ রকম একটা ডিসিশন নিলে তোর জন্য টার্গেটটা অনেক ছোট এবং স্পেসিফিক হয় এবং সেটার জন্য সাহসও করা যায়। অ্যাটেম্পট নেওয়াটা ইজিয়ার হয়।

T দিয়ে Timebox

এই T দিয়ে বোঝায় টাইমবক্স (Timebox)। অর্থাৎ তোকে একটা টাইমবক্স সেট করতে হবে। ধর, সারা দিনে তুই অনেক হাবিজাবি কাজ করস। ইউটিউবে এনজয়, নেটফ্লিক্সে বেনজয়, ভিডিও গেমসে ধনঞ্জয়, ফেসবুকে বিশ্বজয়, হেনতেন। ফ্রেন্ডদের সঙ্গে ফোনে আড্ডা,

[illegible] 'মুভিং' [illegible] ফাঁকিবাজি। খেলাধুলা কর। কোনো সমস্যা নাই। শুধু সারা দিনের মধ্যে জাস্ট দুই ঘণ্টার দুইটা টাইমবক্স সেট করবি। এগুলোকে আমি বলি ডিসকানেকটেড বা অ্যানালগ টাইমবক্স।

ফলে সারা দিনের মধ্যে মোট চার ঘণ্টা সলিড টাইমবক্স হয়ে যায়। তুই সারপ্রাইজড হয়ে যাবি যে অন্য সময় তুই সারা দিনে যতটুকু পড়তি, দুই ঘণ্টার দুইটা টাইমবক্সের মধ্যে তুই তার চাইতে বেশি পড়ালেখা করে ফেলতে পারবি।

R দিয়ে Reward

এই R দিয়ে বোঝায় রিওয়ার্ড (Reward)। কারণ কী? ছোটবেলায় তোকে যখন তোর আম্মু বলত যে এই অঙ্কটা শেষ কর বা তুই যদি ক্লাসে ভালো রেজাল্ট করস তাইলে তোকে আইসক্রিম দিব। নতুন জামা কিনে দিব। অথবা এই জিনিসটা খাইতে দিব বা মোবাইলে খেলতে দিব। সেই লোভে বা সেই আশায় কিন্তু তুই সিরিয়ালসি পড়ালেখা করতি।

এখন সেই রিওয়ার্ড সিস্টেমটা তোকে আবার চালু করতে হবে। নিজে নিজে। ধর, তুই একটু পরে খাবি। তার আগে তুই বিশ মিনিট বা ত্রিশ মিনিটের একটা শর্ট স্পেসিফিক টার্গেট সেট করে ফেল। আচ্ছা, আমি যদি এই কাজটা ফিনিশ করতে পারি, তাইলে তারপরে গিয়ে লাঞ্চটা বা ডিনারটা করব।

যখন তুই এই কাজটা শেষ করে লাঞ্চ করতে যাবি, তখন ওই লাঞ্চটা তোর কাছে একটা রিওয়ার্ড হিসেবে চলে আসবে। হয়তো তুই খাইতিই কিন্তু এখন একটু স্ট্র্যাটেজিকভাবে তোর ওই খাওয়াটা তোর কাছে একটা রিওয়ার্ড হিসেবে আসবে।

একইভাবে তুই হয়তো একটা জামা কিনবি বা ব্যাকপ্যাকই কিনবি, কিন্তু একটা কন্ডিশন দিয়ে দিলি। ঠিক আছে আমি যদি এই চ্যাপ্টারের চল্লিশটা অঙ্ক শেষ করতে পারি তাইলে আমি এই কাজের রিওয়ার্ড হিসেবে নিজেকে এই জামাটা উপহার দিব। তার মানে তুই উপহার

দিচ্ছিস বা পুরস্কার হিসেবে পাচ্ছিস। তখন ওই জিনিসটা তোর নিজের একটু ভালো ফিল হবে। যতবার তুই ওই জামাটা পরবি, ততবার তোর মনে হবে আচ্ছা, কেমেস্ট্রির প্রথম দশ চ্যাপ্টার রিভিশন দেওয়ার রিওয়ার্ড হিসেবে আমি এই জামাটা পাইছি।

এই রেস্ট (REST) থিওরি অ্যাপ্লাই করলে যার পড়তে ভাল্লাগে না, পড়তে মন চায় না বা পড়তে ইচ্ছে করে না। সে এই সিস্টেম দিয়ে পড়ালেখা এনজয় করতে পারবে।

ইন্টারনেট, মোবাইল ফোন কি তোর লাইফ ছেঁড়াবেড়া করে দিচ্ছে? কোনো কিছু করতে বসলে, কোনো কিছু শিখতে বসলেই কি তুই ইন্টারনেটের মধ্যে হারিয়ে যাস? যদি হারিয়ে যাস তাহলে ইন্টানেট বা মোবাইলের চক্করে তোর ফিউচারকে রক্ষা করার জন্য তুই কোন তিনটা কাজ আজকে থেকে করা শুরু করবি? সেগুলা নিচে লেখ।

তোর উত্তর–

১.

২.

৩.
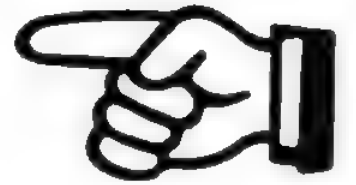
ক্যারিয়ারে বেদিশা হয়ে, বুক করলে চিন চিন

ভার্সিটি থেকে পাস করে যাচ্ছে শাবাব। এত দিনে ভার্সিটিতে কিছুটা নাম করে ফেলছে শাবাব। ডিপার্টমেন্টে ফোর্থ হয়েছে। ডিবেটিং ক্লাবের সেক্রেটারি। ক্যারিয়ার ক্লাবের প্রেসিডেন্ট সে। পাস করে যাওয়ার আগে ভার্সিটির ফার্স্ট ইয়ার ও সেকেন্ড ইয়ারের কয়েকজন মিলে দেখা করতে আসছে শাবাবের সঙ্গে। তাদের নিয়ে শাবাব চা খেতে বসেছে ক্যানটিনে। সেখানে আফিফ নামের একজন শাবাবকে জিজ্ঞেস করল।

আচ্ছা শাবাব ভাই, আপনার তো সব সেট। পাস করার আগেই জব অফার পেয়ে গেছেন। হয়তো কদিন পর স্কলারশিপ পেয়ে দেশের বাইরে চলে যাবেন। এই দিকে আমাদের অবস্থা তো কেরোসিন। চোখে-মুখে অন্ধকার দেখি। কিছু একটা করতে হবে। কিন্তু উপায় কী? ক্যারিয়ার কীভাবে সেট করব?

— না আফিফ, অত বেদিশা হয়ে বুক চিন চিন করার দরকার নাই। আমি তিন রকমের ক্যারিয়ারের কথা বলে দিব। তুই যেকোনো একটা লাইনে অ্যাকশন নিলেই ক্যারিয়ার দাঁড়িয়ে যাবে।

চাল্লু ক্যারিয়ার

তুই একটু চোখ বন্ধ করলেই বলে দিতে পারবি তোর ক্লাসের বা তোর আশপাশের কোন ছেলেটা বা কোন মেয়েটা ভালো করবে। কারণ শুধু তুই না; বরং তোর আশপাশের সবাই জানে— সে খুব সিনসিয়ার বা পড়ালেখায় খুব ভালো অথবা অ্যাকটিভিটিগুলাতে সে খুবই রেগুলার, খুবই অর্গানাইজড। রেস্পন্সিবিলিটি নেয়। তাকে কোনো একটা কাজ দিলে সে ঠিকমতো করে ফেলতে পারে।

তার মানে যে পারসনটা তার ভার্সিটি লাইফে সিনসিয়ার থাকে। হয় পড়ালেখার দিকে অথবা এক্সট্রা কারিকুলারের দিক থেকে অথবা দুইটাতে। সে কিন্তু তার ক্যারিয়ারটা ভার্সিটি লাইফেই ডেভেলপ করে ফেলে। তার সঙ্গে সিনিয়র ভাইয়া-আপুদেরও কানেকশন থাকে। পাস করার পরে চাকরি কিন্তু সে-ই আগে পেয়ে যায়। একটু

খেয়াল করলেই বুঝতে পারবি ওর ক্যারিয়ারটা কিন্তু পাস করার পরে চাকরিতে জয়েন করার সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয় নাই; বরং ওর ক্যারিয়ারটা শুরু হয়ে গেছে ভার্সিটিতে ঢোকার শুরু থেকে। সো, তুই যদি চাম্পু ক্যারিয়ার করতে চাস তাইলে তোকে ভার্সিটি লাইফেই সিনসিয়ার হতে হবে।

চলনসই ক্যারিয়ার

ধর, তুই ভার্সিটি লাইফের প্রথম দুই-তিন বছর প্রেমের জলে, আড্ডার তলে, আলসেমির ফলে কিংবা নিজের ভুলে তেমন কিছু করতে পারস নাই। এখন থার্ড ইয়ারে এসে তোর হুঁদিস হইল, আচ্ছা এখন তো আমাকে পাস করতে হবে। সংসারের হাল ধরতে হবে। ইনকাম করে ফ্যামিলিকে সাপোর্ট দিতে হবে। ওইদিকে আমার যার সঙ্গে আংটা লাগানো আছে তার ফ্যামিলিও খোঁচা দিচ্ছে।

তোর যখন হুঁদিস হবে তখন তুই যদি হুড়হুড় করে কিছু একটা রাস্তা বের করস। আচ্ছা ঠিকাছে— আমি এই সাবজেক্টে পড়তেছি, এইটা হচ্ছে ক্যারিয়ার, এইটাতে আমার একটু ভালো হইতে হবে। এই জিনিসগুলা কোন কোন জায়গা থেকে শেখা যায়? তুই অনলাইনে বা ইউটিউবের ভিডিও দেখে ওই একটা টপিকে একটু এক্সপার্ট হওয়ার চেষ্টা করলি। অর্থাৎ তুই লাস্ট মোমেন্টের ক্যারিয়ারটাকে ডেভেলপ করার জন্য এক্সট্রা সময় দেওয়া শুরু করলি।

হায় হায় ক্যারিয়ার

এই হায় হায় ক্যারিয়ারওয়ালাদের ভার্সিটি লাইফের চার বছর চলে যায় বারবার ফেল করতে করতে বা কোনো রকমে টেনেটুনে পাস করতে করতে। তারপরেও ওদের দেমাগের বাত্তি জ্বলে না; বরং এদের হুঁদিস হয় জোড়াতালি দিয়ে পাস করার পরে। তখন হায় হায় করে বলে— আমার এখন কী হবে? আমাকে চাকরি কে দিবে? বাসা থেকে টাকা দেওয়া বন্ধ। মেসের টাকা নাই। আমি এখন কই যাই? যাওয়ার কোনো জায়গা নাই।

তখন তারা নাকানিচুবানি খাওয়া শুরু করে চিন্তা করে, আচ্ছা এই সাবজেক্টে পড়া ভুল হয়ে গেল, অন্য সাবজেক্টে পড়লে ভালো হতো। এরপর দুই বছর বিসিএসের পিছনে ঘোরে। কোনো হদিস না পেয়ে ব্যাংকের চাকরি খোঁজে। এইভাবে আরও তিন বছর নষ্ট করে।

শেষ পর্যন্ত ওদেরও একটা না একটা গতি হয়। হয়তো শুরুর দিকে অনেক অনেক কষ্ট হয়। কিছু সময় ফ্রাস্টেশন আর টেনশন দিয়ে যায়। তারপরও ওরাও শেষ পর্যন্ত কোনো না কোনো একটা রাস্তা ঠিকই বের করে ফেলে।

এত কথার সামারি হচ্ছে, লাইফে তুই এই তিনটা ক্যারিয়ারের যেটাই নিস না কেন। একটা না একটা সময় সেই পরিমাণ কষ্ট তোকে করতেই হবে। তাই সময় যদি থাকে আগেই কষ্টটা কর। আগেই লাইফটাকে লাইনে আনার চেষ্টা কর। আর তুই যদি কষ্ট এখন করতে না চাস, কষ্ট থেকে বাঁচার কোনো উপায় নাই। হয় আজকে কষ্ট করবি, নাহয় আগামীকাল করবি, নাহয় পরশু। অর্থাৎ কষ্ট তোকে করতেই হবে। কষ্ট না করলে কেষ্ট বা মিষ্ট কোনোটাই মিলবে না।

আর এই তিনটার কোনোটাই যদি ব্যাটে-বলে টাইমিং করতে না পারস, সে ক্ষেত্রে চার নম্বর অপশন হচ্ছে– বড়লোক শ্বশুর দেখে একজনকে বিয়ে করে ফেলা।

মামা-খালুর লিংক পেলে, উপচে পড়বে আয়োডিন

আসিফ আবার জিজ্ঞেস করল,

শাকিব ভাই, অনেকেই তো বলে মামা-খালু ছাড়া চাকরি পাওয়া যায় না। তাহলে আমি কীভাবে চাকরি পাব? আমার তো কোনো মামা-খালু নাই। আয়োডিন, ক্লোরিন কোনোটাই নাই।

– বিশ্বাস করস আর না করস– দুনিয়ায় যত হায়ারিং হয়, যত মানুষ চাকরি পায় তার ৭০% মানুষ চাকরি পেয়ে যায় মামা-খালুর জোরে বা কারও সঙ্গে কানেকশন আছে সেই নেকনজরে। কিংবা কেউ তার সিভি/রেজুমি রেফার করছে, সেই রেফারেন্সে। তাই, কেউ যদি বলে, 'মামা-খালু ছাড়া চাকরি জোগাড় করা যায় না।' ঘটনা কিন্তু সত্যি।

আমি যে জবটা পাইছি। সেটাও আমাদের এক সিনিয়র ভাইয়ের রেফারেন্সে। রাজীব ভাই নামে একজন আছেন। তোরা যখন ফার্স্ট ইয়ারে ছিলি, তখন উনি পাস করে গেছেন। তোরা হয়তো চিনবি না। তিনিই মূলত আমার মামা-খালু। তার বদৌলতেই আমি জবটা পাইছি।

তো, এখন প্রশ্ন হচ্ছে– তুই মামা-খালু কই পাবি? টেনশন করার কিছু নাই। আমি তিনটা সিস্টেম বলে দিব। তাহলে খুব সহজেই মামা-খালু, মামানি-খালামণি, এমনকি মামাতো বোন-খালাতো বোন সব জোগাড় করে ফেলতে পারবি। খুবই সিম্পল ব্যাপারস্যাপার।

সিনিয়র মামা-খালু

সবচেয়ে সহজ সিস্টেম হচ্ছে, সিনিয়র ভাইয়া এবং আপুরাই হচ্ছে মামা-খালু। ধর, তুই যখন ভার্সিটির ফার্স্ট ইয়ার বা সেকেন্ড ইয়ারে ছিলি। থার্ড ইয়ার বা ফোর্থ ইয়ারে যে ভাইয়া বা আপুরা ছিলেন তারা কিন্তু দুই বছর পরে আর ক্যাম্পাসে নাই। ওরা কোনো না কোনো একটা জায়গায় চাকরি পেয়ে গেছেন। এখন যদি তোর সঙ্গে ওইসব সিনিয়র ভাইয়া বা আপুর একটা কানেকশন বা রিলেশান থাকে, তাহলে ফিউচারে ওদের জিজ্ঞেস করতে পারবি তাদের অফিসে কোনো হায়ারিং হচ্ছে কি না।

[illegible] উল্টাটাও ঘটতে পারে। অর্থাৎ ওদের অফিসে বা ওদের টিমে কোনো পজিশন খালি হলে ওরাও তোকে নক দিতে পারে। বলা যায় [illegible] কোনো ওদের অফিসে তুই ইন্টারভিউর জন্য ডাক পাইলে, তুই জানস কোন সিনিয়র ভাইয়া-আপু কোথায় জব করছে। তখন তুই তাদের জিজ্ঞেস করতে পারবি, ওই কোম্পানির ইন্টারভিউয়ে কী রকম প্রশ্ন করে?

এমনকি কোনো সিনিয়রের সঙ্গে ভালো যোগাযোগ থাকলে তুইও রিকোয়েস্ট করতে পারস, তোর সিভিটা ফরোয়ার্ড করে দিতে। তিনি ফরোয়ার্ড করে দিলে তোর সিভি কিছুটা প্রায়রিটি পেয়ে গেল। তার সঙ্গে সঙ্গে তুই তোর সিনিয়র ভাইয়া-আপুকে তোর মামা-খালু হিসেবে কাজে লাগায় ফেললি।

তবে হুট করে কোনো সিনিয়রকে রিকোয়েস্ট করলেই সে তোর জন্য গলে যাবে না। এ জন্য ক্যাম্পাসে থাকার সময় তাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে হয়। ডিপার্টমেন্টে দেখা হলে কথা বলতে হয়। তারা ডিপার্টমেন্টের কোনো ইভেন্টে বা কোনো ক্লাবের কমিটিতে থাকলে এবং তুইও যদি সেই ক্লাবের সদস্য হয়ে থাকস। তাহলে ক্যাম্পাসে থাকতেই ওদের সঙ্গে তোর একটা কানেকশন, একটা ভালো কমিউনিকেশন তৈরি হয়ে যাবে।

প্রফেশনাল মামা-খালু

তুই যে ফিল্ডে চাকরি করতে চাস, সেই ফিল্ডে যারা প্রফেশনালভাবে কাজ করে তাদের তুই মামা-খালু বানাইতে পারবি। খুবই সিম্পল একটা ব্যাপার। এই প্রফেশনালদের মধ্যে একটা গ্রুপ তোর হাতের কাছেই আছে। তারা হচ্ছে তোর ডিপার্টমেন্টের টিচার। কারণ ডিপার্টমেন্টের যারা টিচার তাদের সবারই কম-বেশি ইন্ডাস্ট্রিতে কানেকশন আছে। এ ছাড়া তাদের ফ্রেন্ডরাই বিভিন্ন কোম্পানিতে এত দিনে বড় বড় পজিশনে এ চলে গেছেন। প্লাস কোনো কোম্পানির লোক লাগলে তারা অনেক সময় টিচারদের রিকোয়েস্ট করে ভালো কাউকে দিতে পারবে কি না।

[illegible] তুই একটু চোখ কান খোলা রাখলে তোর ভার্সিটির বাইরের অন্য ভার্সিটির সেইম ডিপার্টমেন্টের সিনিয়রদের প্রোফাইল চেক করতে পারবি। তোর ফিল্ডের কোনো সোশ্যাল মিডিয়া গ্রুপ বা [illegible] ইভেন্ট হলে বা ওয়ার্কশপ, সেমিনার হলে সেখানে যাওয়ার চেষ্টা করবি। ইন্টারেস্টিং প্রশ্ন করার চেষ্টা করবি। এতে একটা পরিচয় ডেভেলপ হবে। এরপর তোর যখন চাকরি লাগবে, তখন তুই মেসেজ দিলে, ওরা রিকগনাইজ করবে। তার মানে এখানেও কিন্তু তোর মামা-খালু তৈরি হয়ে গেল।

আরেকটা চিকন বুদ্ধি হচ্ছে– ভার্সিটির কোনো ইভেন্টে প্রফেশনালদের গেস্ট হিসেবে ইনভাইট করা। যেমন হতে পারে– ক্যারিয়ার ক্লাব, ডিবেটিং ক্লাব, কালচারাল ক্লাব ইত্যাদি কোনো ইভেন্টে। এগুলায় ইনভাইট করলে, কবে ইভেন্ট? কবে আসবে? ইভেন্টে কোন টপিক নিয়ে কথা হবে? এইগুলা নিয়ে আলোচনা করতে করতেই রিলেশন তৈরি হয়ে যায়।

বন্ধু, মামা-খালু

তোর ক্লাসে, তোর ভার্সিটিতে, এমনকি তুই যে সাবজেক্টে পড়তেছস, সেই একই সাবজেক্টে কিন্তু অন্য ভার্সিটিতে তোর সমবয়সী অনেক পোলাপানই আছে। তাদের বেশির ভাগের সঙ্গেই তোর কানেকশন নাই। যোগাযোগ নাই। খাতির নাই। অথচ তুই যদি তোর ডিপার্টমেন্টের ক্লাসমেটদের সঙ্গেই ভালো যোগাযোগ রাখস, ভালো খাতির থাকে, ভালো ফ্রেন্ডশিপ থাকে, তাদের অনেকেই হয়তো তোর আগে চাকরি পেয়ে যাবে। সে যেই কোম্পানিতে চাকরি করে সেখানে যদি নতুন কোনো জব ওপেনিং চলে আসে। তাহলে তোর ফ্রেন্ড কিন্তু তোকে রেফার করে দিতে পারে। ব্যাস, তোর চাকরি হওয়ার একটা সুযোগ, একটা রাস্তা কিন্তু তোর ফ্রেন্ডরাই তোকে দিয়ে দিতে পারে।

সো, ফ্রেন্ড হিসেবে ওদের ইগনোর করা বা ওদের সঙ্গে চালাকবাজি করা ঠিক হবে না; বরং ভার্সিটি লাইফে চেষ্টা করবি ওদের হেল্প করতে। ওরা যাতে জানে যে তুই একজন ভালো পারসন। তাহলে
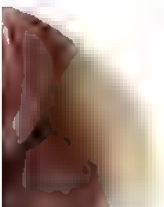
ফিউচারে জবের রেফার করার সুযোগ আসলে বা কোনো জায়গায় সে ইন্টারভিউ দিছিল সেখানে কী কী প্রশ্ন করছে, কোন সিভি দিছে, সেগুলা জানতে চাইলে তারাও তোকে হেল্প করবে এবং তোর ফ্রেন্ডরাই তোর মামা-খালু হিসেবে কাজ করবে। কী মজা!!!

এই মামা-খালু বানানোর কাজটা ইউনিভার্সিটিতে থাকাকালীন কর, দেখবি চাকরি পাওয়াটা হাতের মোয়া হয়ে গেছে।

স্টার্টআপের রিস্ক নিয়ে দেখাইতে পারলে কেরামতি

আফিফ আবার জিজ্ঞেস করল।

ভাইয়া, আমি আর আমার আরেক ফ্রেন্ড মিলে ভাবতেছি একটা স্টার্টআপ শুরু করব। কীভাবে কী করব বুঝতেছি না। আপনি তো ভার্সিটি লাইফে বিজনেস দিছিলেন। তো, আপনার কী মনে হয়। আমরা কি পারব?

– শোন, বিজনেস বা স্টার্টআপও অনেকভাবে করা যায়। তবে আমার বিজনেসে যেহেতু অলরেডি লালবাত্তি জ্বলে গেছে, তাই আমি একটু কঠিনভাবে বলতেছি। যাতে তোরা ঝড়ে বক মারার কেরামতি, কম চেষ্টার মেরামতি, লংটার্ম অসম্মতির ফ্যাসাদে আটকে না যাস। তাই–

আগে চেক কর, তারপর ঝাঁপিয়ে পড়

বিজনেস বা স্টার্টআপ দিতে গেলে, প্রথমেই সবকিছুই নিয়ে নামতে যাবি না। ধর, তুই একটা ফুডের চেইন (একই নাম অনেকগুলা রেস্টুরেন্ট দেশজুড়ে থাকবে) এমন একটা বিজনেস স্টার্ট করতে চাস। প্রথমেই তোকে রেস্টুরেন্ট বা জায়গা ভাড়া নিয়ে ফেলার দরকার নাই; বরং প্রথমেই খাবার বানিয়ে ভার্সিটির সামনে একটা ভ্যানে করে নিয়ে যা। খাবারটা পরিবেশন কর। দেখ, লোকজন খেতে পছন্দ করে কি না। দাম দিতে চাইলে তারা কত টাকা দিতে চায়। আগে ভালো করে বোঝ খাবারের ডিমান্ড আছে কি না। কোয়ালিটি ঠিক আছে কি না। লোকজনের ফিডব্যাক নিয়ে খাবারের উপাদান, স্বাদ, পরিমাণ, দাম, প্যাকেজিং অ্যাডজাস্ট কর। তারপর গিয়ে রেস্টুরেন্ট ভাড়া করার চিন্তা কর।

শুধু রেস্টুরেন্ট না; বরং যে বিজনেসই হোক; আগে ডিমান্ড, কোয়ালিটি বুঝে নিতে হবে। তুই যদি ইলেকট্রনিকসের বিজনেস করতে চাস। ই-কমার্স করতে চাস। না বুঝেই এক লাখ বা পাঁচ লাখ টাকা দিয়ে সাইট বানায় ফেলবি না। তাইলে দেখা যাবে, সাইট বানাইলি, মোবাইল অ্যাপ বানাইলি কিন্তু তোর ওই সাইটে, তুই ছাড়া আর কেউ নাই। তাহলে তো কোনো লাভ হইল না।

করতে না পারলে সেলস, বিজনেস হবে ইউজলেস

এন্ট্রাপ্রেনার হতে হলে তোকে সেলসে ভালো হতে হবে। প্রথম দিকে তোর প্রোডাক্ট বা সার্ভিস বিক্রি করবে একজন মাত্র মানুষ। সেটা হচ্ছিস তুই। তবে তোকে যে শুধু তোর প্রোডাক্ট বিক্রি করতে হবে, বিষয়টা এমন না: বরং তোর কোম্পানিতে কাজ করার জন্য লোকজনকে কনভিন্স করতে হবে। তুই যে এই এন্ট্রাপ্রেনারশিপের জার্নি দিবি। ছয় মাস বা এক বছর তোর কোনো ইনকাম থাকবে না। এই জিনিসটা তোর বাসার লোকজনকে কনভিন্স করতে হবে। তোর যদি স্পেশাল কেউ থাকে তাকে কনভিন্স করতে হবে। এমনকি তুই যদি কারও কাছ থেকে ইনভেস্ট নিতে চাস, তাদের কাছেও তোর এই আইডিয়াটা সেল করতে হবে।

কমে গেলে ধৈর্য, বিজনেস করে দিবে ত্যাজ্য

অনেকেই মনে করে বিজিনেস শুরু করার পরের দিন থেকেই কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা ঝাঁপায় পড়বে। বিষয়টা ওইরকম না: বরং বিষয়টা হবে তুই শুরু করলি, হয়তো একজনের কাছে কিছু একটা প্রোডাক্ট বিক্রি করতে যাবি। বিজনেস স্টার্ট করার আগে সে বলবে– আমরা কিনব খুবই ভালো আগেড়া-বাগেড়া। পরে যখন তুই প্রোডাক্ট নিয়ে হাজির হবি, তখন বলবে– আজকে না। আজকে বৃষ্টি বেশি। ঢাকার রাস্তায় জ্যাম বেশি। ড্রেনের মধ্যে ময়লা বেশি। ময়লার মধ্যে ক্যালরি বেশি। ইত্যাদি ইত্যাদি।

তাই তোকে আগে থেকেই ঠিক করতে হবে কীভাবে ধৈর্য ধরে তুই অল্প টাকা দিয়ে চলতে পারবি। টাকাপয়সা ছাড়াও আরও কত-কী যে হবে। সবকিছু ঠান্ডা মাথায় ধৈর্যসহকারে ফেইস করার মেন্টালিটি থাকতে হবে। তাহলে আজ না হয় কাল তুই বিজনেস ঠিকই দাঁড়া করাতে পারবি।

ফিউচার করতে ফিক্স, নিতে হবে ক্যালকুলেটেড রিস্ক

বিজনেস করতে গেলে সব সময় রিস্ক থাকবে। যেমন মাস শেষ হইলে স্যালারি দেওয়ার মতো এনাফ টাকা থাকবে কি না। ক্লায়েন্টকে দেওয়া সব কমিটমেন্ট তুই এবং তোর টিম হ্যান্ডেল করতে পারবি কি না। যে কোয়ালিটি বা সার্ভিস দিবি সেটা নিশ্চিত করতে পারবি কি না। ঠিকমতো সব কাজ করে দেওয়ার পরেও কেউ টাকা মেরে দিবে কি না।

কোনো প্রজেক্টের মাঝখানে কোনো টিমমেম্বার চলে যাওয়ার রিস্ক থাকে। নতুন একটা প্রোডাক্ট বা সার্ভিস অনেক কষ্ট করে স্টার্ট করলি কিন্তু কেউ আগ্রহ না দেখানোর রিস্ক থাকে। বিজনেসে লস খাওয়ার, ধরা খেয়ে মরা হওয়ার রিস্ক থাকে। এই সব রিস্ক ক্যালকুলেট করতে হবে। তারপরও সাহস নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে।

ডিসিশন মেকিং ক্যাপাসিটি, বাড়িয়ে দিবে ভেলোসিটি

তোর অনেক অনেক ডিসিশন মেক করতে হবে। বিশেষ করে আনসারটেইনিটির মধ্যে ডিসিশন মেক করতে হবে। ধর, তোর কাছে এনাফ ইনফরমেশন নাই যে এদিকে গেলে ভালো হবে না ওদিকে গেলে ভালো হবে। অথবা প্রোডাক্টের প্রাইস কত হওয়া উচিত। বেশি রাখলে হয়তো মানুষ কিনতে চাইবে না। আবার কম রাখলে তোর লস হবে। এমনকি কেউ একজনকে টিম মেম্বার হিসেবে হায়ার করবি নাকি করবি না। করলে সে থাকবে নাকি বিজনেসের লালবাতি জ্বালিয়ে দিবে। এইরকম যে কতশত ডিসিশন মেক করতে হবে তার শেষ নাই।

জ্ঞান না করলে ব্যাও, বিজনেস হবে সমাপ্ত

সবকিছুই কিন্তু একজন এন্ট্রাপ্রেনিউরের রেসপন্সিবিলিটি। স্পেশালি যখন তার কোম্পানির সাইজ দশজনের নিচে থাকে। তখন তাকে অ্যাকাউন্টিং করতে হবে। ফাইন্যান্স করতে হবে। মার্কেটিং করতে হবে। এইচআরের কাজ করতে হবে। প্রোডাক্ট ডিজাইন, নেগোসিয়েশন,
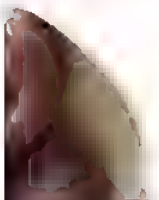
সেলস, কাস্টমার সার্ভিস, মানি ম্যানেজমেন্ট, সবকিছু করতে হবে। তাই তোকে একজন কুইক লার্নার হতে হবে।

ধাড়া না থাকলে অ্যানটেনা, বিজনেস লাইমলাইট পাবে না

চাকরি করলে একটা স্ট্যাবল লাইফ থাকবে, উইকেন্ডগুলা তুই ঠিকমতো চালাইতে পারবি। মাঝেমধ্যে ফ্যামিলিকে টাইম দিতে পারবি। কিন্তু বিজনেস শুরু করলে, উইক ডে তো যাবে যাবেই, উইকেন্ডও যাবে। রাতের টাইমও যাবে। সকালের টাইমও যাবে। হয়তো রাত দুইটা বাজে তোর ফোন ধরা লাগবে। এইরকম অবস্থা চলবে মোটামুটি পাঁচ থেকে সাত বছর। তারপর তুই যখন একটা লেভেলে যাবি, তখন তুই কোয়ালিফাইড কিছু লোক হায়ার করতে পারবি। তার আগ পর্যন্ত তোকে ওইসব রেসপন্সিবিলিটি নিয়েই চলতে হবে।

না থাকলে প্যাশন, সাকসেস পাবে না ইগনিশন

বিজনেস যেহেতু লম্বা সময়ের একটা বিষয়, তাই এই বিষয়ের পিছনে লেগে থাকতে গেলে ধৈর্যের পাশাপাশি প্যাশন লাগবে। প্যাশন এমন একটা জিনিস যেটা থাকলে তুই কোনো লাভ না হলেও সেটার পিছনে লেগে থাকতে পারবি। আগ্রহ থাকবে। ইন্টারেস্ট থাকবে এবং লাভ না হলেও এনজয় করতে পারবি।

বিজনেস শুরু করলে প্রথম পাঁচ-সাত বছর তোর ইনকাম, তোর সঙ্গে যারা চাকরি শুরু করেছে তাদের চাইতে কম হবে। তবে তুই যদি লেগে থাকতে পারস। যদি পাঁচ-সাত-দশ বছর চালাইতে পারস। তাহলে পাঁচ-সাত বছর পরে ধপাশ করে তোর লেভেলটা এমন জায়গায় উঠে যাবে যে ওরা আর তোকে ধরতে পারবে না। হয়তো তত দিনে দেখবি তোর কোম্পানিতে দুই শ লোক কাজ করে। তখন দুই শজনের ইফোর্ট আর ইমপ্যাক্টের বেনিফিট তুই পাবি।

সো, এন্ট্রাপ্রেনিউরশিপ বা স্টার্টআপের জন্য এফোর্ট বেশি দিবি, তেল বেশি বের করবি। কয়েক বছর পরে মিষ্টি বেশি পাবি।

গেরিলা টেকনিকই এনে দিবে প্যারেন্টসদের সম্মতি

শাবাবের কথা শুনে আফিফের ফ্রেন্ড জিজ্ঞেস করল,

— ভাইয়া, আমি স্টার্টআপ বা বিজনেস নিয়ে অনেক অনেক বেশি ইন্টারেস্টেড। কিন্তু আব্বু-আম্মু রাজি না। তারা চান যে আমি শুধু বিসিএস দিই। কিন্তু আমার ইচ্ছা স্টার্টআপ করব। এখন আব্বু-আম্মুকে কীভাবে কনভিন্স করব।

শুধু বিজনেসের জন্য না; বরং ভার্সিটি, সাবজেক্ট সিলেকশন, ক্যারিয়ার ইত্যাদি বিষয়ে প্যারেন্টসদের কনভিন্সড করতে না পারার জন্য কত পোলাপানের লাইফ যে ছেঁড়াবেড়া হয়ে যায়। সেটা ভুক্তভোগীরাই জানে। অথচ একটু টেকনিক অ্যাপ্লাই করলে, স্মার্টলি প্যারেন্টসদের কনভিন্সড করে ফেলা যায়। সে রকম হয়টা স্মার্ট টেকনিক-

১. গেরিলা টেকনিক

এইটা ধরি মাছ না ছুঁই পানিটাইপের টেকনিক। অনেকটা গেরিলা যুদ্ধ যারা করে। তাদের মতো করে। তুই মোটামুটি তিন থেকে ছয় মাসের একটা টার্গেট সেট করবি। সুযোগ পেলেই যে ক্যারিয়ারের জন্য রাজি করাতে চাস, সেই লাইনে যারা ভালো করেছে তাদের গুণগান করবি। আগে থেকে সেট করে ফ্রেন্ডকে দিয়ে ফোন করিয়ে সেই ফিল্ড সম্পর্কে শুনিয়ে শুনিয়ে বলবি— ও তুই তো ওই লাইনে গিয়ে ভালো করেছিস। শুনেছি সেটার ফিউচার ভালো। সহজেই উল্টায় ফেলা যায়। টাকাপয়সা ভালো।

সম্ভব হলে সেই লাইনের কোনো সিনিয়রকে বাসায় দাওয়াত দিবি। আবার যে ফিল্ডে তোর আব্বু-আম্মু নিতে চাচ্ছে, সেই ফিল্ডের খারাপ খবর শোনাবি। তাহলে ইনডাইরেক্টলি ধীরে ধীরে ওনাদের মনের ভিতরের সেই ফিল্ড সম্পর্কে ভয় আর তোর টার্গেট ফিল্ড সম্পর্কে ভালো মনে হওয়া শুরু হবে। এইভাবে স্লো স্লো স্টাইলে কয়েক দিন চালালে কনভিন্স করা অনেক ইজিয়ার হয়ে যাবে।

২. দুলাভাই টেকনিক

সব ফ্যামিলিতে ডিসিশন মেকার থাকে একজন বা দুজন আর ইনফ্লুয়েন্সার থাকে একজন। সেটা হতে পারে তোর দুলাভাই। একটু সিনিয়র কাজিন কিংবা মামা-চাচা-খালুটাইপ কেউ। এখন তোর কাজ হচ্ছে ওনাদের কনভিন্স করা। আর কনভিন্স করার আগে তুই যে ফিল্ডে যেতে চাস সেই রিলেটেড হোমওয়ার্ক করে যাবি। হয়তো সেই ফিল্ড রিলেটেড ভালো কিছু করে দেখাবি। তাহলে তাদের কনভিন্স করতে পারলেই তোর কনভিন্স করার কাজ ৯০% শেষ। তারাই তোর আব্বু-আম্মুকে বুঝিয়ে রাজি করে ফেলবে।

২.৫. উকিল টেকনিক

দুলাভাই টেকনিকের একটা ডিফারেন্ট ভার্সন আছে। যেটাকে আমি বলি উকিল টেকনিক। ধর, ডিপার্টমেন্টাল পিকনিকের জন্য তোকে দেশের বাইরে যেতে হবে বা পিকনিকে যেতে হবে। কিন্তু বাসা থেকে রাজি হবে না। ১০০% নিশ্চিত। এ ক্ষেত্রে তোর বাসায় যাবে তোর ফ্রেন্ড সে ইনডাইরেক্টলি তোর আম্মুকে কনভিন্স করবে। বলবে এইটার জন্য এত ক্রেডিট। না হলে পাস হবে না। অন্য অপশন নাই। আমার আম্মুও রাজি হচ্ছিল না। পরে স্যারের কথা শুনে– রাজি হইছে। এই সব জিনিস।

এইভাবে সে তোর বাসায় কনভিন্স করল। এখন তার বাসায় কে কনভিন্স করবে? সেখানে কনভিন্স করতে যাবি তুই। অর্থাৎ তোরা দুজন ফেইক উকিল হয়ে দুজন দুই বাসাকে রাজি করে ফেলবি।

৩. ভদ্র বাচ্চা টেকনিক

এইটা অনেকটা ওপরে ফিটফাট ভিতরে সদরঘাটটাইপের টেকনিক। ধর, ফ্যামিলিকে কোনো জিনিসের জন্য রাজি করাতে হবে। তার কয়েক মাস আগে থেকে তুই দুনিয়ার সবচেয়ে ভদ্র বাচ্চা হয়ে গেলি। একদম রুটিনমতো পড়ালেখা করস, ঠিক সময়মতো নামাজ-কালাম করতেছস। রেজাল্ট ভালো করতেছস। যা যা করা উচিত সব করে

ফাটিয়ে ফেলতেছস। তোর ডিসিপ্লিন, তোর ডেডিকেশন দেখে তোর ফ্যামিলি মনে করবে– না এর মতো ফেরেশতা বাচ্চা মনে হয় আর একটাও হয় না। সে যা করে– খুবই ভালোভাবে করে।

ওনারা যেগুলা পছন্দ করে, সেগুলা বেশি করে করবি আর ওনারা যেগুলা পছন্দ করে না, সেগুলা করবি না। এমন ভালো একটা ইম্প্রেশন তৈরি করতে পারলে তোর ওপরে ফ্যামিলির সবার কনফিডেন্স বেড়ে যাবে। ফ্যামিলিকে কনভিন্স করা অনেক সহজ হবে।

৪. অসহায় টেকনিক

সিচুয়েশন বুঝে অসহায় টেকনিকও অ্যাপ্লাই করতে পারস। এ ক্ষেত্রে তুই ইচ্ছে করেই তোর অপশন কমিয়ে ফেলবি। ধর, তোর আর্কিটেকচারে পড়ার ইচ্ছা। সে জন্য তুই ইচ্ছে করেই CSEতে চান্স পেলি না বা চান্স পেলেও বাসায় জানালি না। বাসায় গিয়ে হেব্বি মন খারাপ। এখন কী করব? ফিউচার কী হবে? যখন আর কোনো অপশন বাকি থাকবে না। তখন বাধ্য হয়েই তোর লাস্ট অপশনের জন্য রাজি করানো সহজ হবে। তখন বগল বাজাতে বাজাতে আর্কিটেকচারে পড়তে চলে যাবি।

৫. শোঅফ টেকনিক

আমার পরিচিত একজন সারা দিন রুমের মধ্যে বসে বসে ভিডিও গেম খেলত। বাবা-মা তো সেই লেভেলের বিরক্ত। কিছুদিন পরে সে ভার্সিটির ভিডিও গেমস প্রতিযোগিতায় যখন চ্যাম্পিয়ন হয়ে প্রাইজমানি তার মায়ের হাতে তুলে দিল, তখন মা বিশ্বাস করতে শুরু করল– এই ফিল্ডে কিছু একটা আছে। তার কিছুদিন পরে সে আর তার টিম যখন ভারতে গিয়েও পুরস্কার জিতে আসল, তখন তার জয়গান দেখে বাসার সবাই আর কিছু বলে না। অর্থাৎ তার এই ক্যারিয়ারে বাসার সবাই রাজি।

সো, ধৈর্য ধরে কিছু করে দেখাতে পারলে– কিছু এচিভ করে শোঅফ করতে পারলে প্যারেন্টসদের রাজি করানো অনেক সহজ হয়ে যায়।

৬. ঘাউড়া টেকনিক

এইটা emotional টেকনিক। কেউ কেউ করে ইচ্ছে করে, ছোট সাইজের রাগ করে। যে আমাকে এটা করতে না দিলে আমি খাব না। ব্যস, দুই-তিন দিন না খাওয়ার ভান ধরে। গোস্‌সা করে। পরে জোর করে বাবা-মাকে রাজি করিয়ে ফেলে। যদিও আমি এই ঘাউড়া টেকনিকের পক্ষপাতী না। তবে কেউ কেউ এই সিস্টেমে কাজ সারিয়ে ফেলে।

শেষ কথা হচ্ছে, সব মা-বাবাই চায় সন্তান ভালো থাকুক। ফিউচার ভালো হোক। তাই ওনারা জেনে-শুনে যে লাইনে রিস্ক বেশি বা ভরসা কম পান সেই লাইনে সন্তান যাক, সেটা চান না। কারণ ওনারা চান সন্তানদের ফিউচার পোক্ত হোক। সে জন্য ওনারা যেটা ভালো মনে করেন, সেটাই সন্তানদের করতে বলেন। তাই তুই যদি ২০০% নিশ্চিত থাকস যে তুই তোর সিদ্ধান্তের প্রতি ২০০% কমিটেড এবং মোটামুটি কনফিডেন্ট সেই লাইনে ভালো করবি। লেগে থাকতে পারবি। এনজয় করবি। তাহলে প্যারেন্টসদের কনভিন্স করার জন্য ওপরের টেকনিকগুলা অ্যাপ্লাই করতে পারস।

তুই কি ফিউচারের জন্য মামা-খালু জোগাড় করে রাখছস? দরকার হলে যাদের কাছে তুই ধরনা দিতে পারবি। হেল্প চাইতে পারবি? তুই কি জানস তোর ক্যারিয়ার কী? ফিউচারে তুই কী হতে চাস? কী করতে চাস?
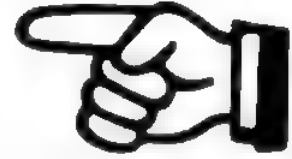
তোর উত্তর–

আমি হতে চাই: ----------------------------

আমার টার্গেটের জন্য এই তিনটা কাজ আজকে থেকে শুরু করে দিবই দিব।

১.

২.

৩.

লো কনফিডেন্স গুঁতা মারলে লুজ হবে মেশিনারি

শাবাব আসছে তার মামার বাসায়। তাদের কাছ থেকে বিদায় নিতে। দুই দিন পরেই সে দেশের চলে বাইরে যাচ্ছে। হায়ার স্টাডি করতে। অনেকক্ষণ গল্প করার পর শাবাবের মামাতো ভাই জিজ্ঞেস করল,

ভাইয়া, আমি তো এইবার ফার্স্ট ইয়ারে। ভার্সিটিতে গিয়ে দেখি অনেক কোর্স। কোর্সের অনেক প্রেশার। সব সাবজেক্টের পড়া ঠিক রাখতে হিমশিম খাচ্ছি। তাই মাঝেমধ্যে আমি ভরসা পাই না। কনফিডেন্স পাই না। আবার মাঝেমধ্যে মনে হয় সব উল্টায় ফেলব। এমন কেন হয়?

এসব শুনে শাবাব বলতে শুরু করছে–

শোন, ভাত কম খাইলেও সমস্যা– পেট খালি খালি লাগবে। পেটের ভিতরে কাঁচুরমাচুর করবে। আবার ভাত বেশি খাইলেও সমস্যা। হাঁসফাঁস লাগবে। গলা দিয়ে বের হয়ে যাবে যাবে অবস্থা হয়। একইভাবে তাপমাত্রা জিনিসটাও বেশি হয়ে গেলে গরমের চোটে বাসার বাইরে যাওয়া যায় না। ফ্যান ছেড়ে বাসার মধ্যেও বসে থাকা যায় না। আবার তাপমাত্রা জিনিসটা খুব কম হয়ে গেলে শীতের কামড়ে লেপের নিচেও শান্তিমতো থাকা যায় না।

আত্মবিশ্বাস জিনিসটা অনেকটা তাপমাত্রার আর ভাত খাওয়ার মতো। আত্মবিশ্বাস অনেক বেশি হয়ে গেলে, পোলাপান আত্মবিশ্বাসের ঠেলায় কিছু না করে বসে থাকে। আবার আত্মবিশ্বাস কম হয়ে গেলেও কিছুই হবে না মনে করে বসে বসে হা-হুতাশ করে।

আত্মবিশ্বাস কম হলেও কিছু না করে সময় নষ্ট করবে। আবার আত্মবিশ্বাস বেশি হয়ে গেলেও কাজটা না করে সময় নষ্ট করবে।

তাই আত্মবিশ্বাস হতে হবে অপটিমাম। একদম সঠিক পরিমাণ। এই সঠিক পরিমাণ আত্মবিশ্বাসের ফর্মুলা হচ্ছে– আমি পারব কি পারব না। আমার আত্মবিশ্বাস আছে কি নাই, সেটা নিয়ে চিন্তা করা যাবে না; বরং চিন্তা করতে হবে– কী করা লাগবে এবং সেটা সঙ্গে সঙ্গে করে ফেলতে হবে। চিন্তা করার সঙ্গে সঙ্গে কাজটা করা শুরু

না করলেই, আমাদের মাথার ভিতরের অলস-কলস বান্দরটা বুদ্ধি প্যাঁচাতে শুরু করে, কাজের জিনিসের চাইতে আকাজের জিনিসের দিকে ডাইভার্ট করে ফেলে।

তাই আজকের পর থেকে আত্মবিশ্বাস আছে কি নাই। সেটা শুনতে যাবি না। কাজটা তুই করতে পারবি কি পারবি না। সেটাও হিসাব করতে যাবি না। এক কেজি আত্মবিশ্বাস লাগবে নাকি এক টন লাগবে, সেটার খোঁজ নিতে যাবি না। জাস্ট নিজেকে সিম্পল একটা প্রশ্ন কর– আমার কি এই কাজটা করা লাগবে? উত্তর যদি ইয়েস হয়, তাহলে এই মুহূর্তে শুরু করে দে। শুরু করা ছাড়া আর কোনো বিশেষ প্ল্যান বা রুটিন বানানোর দরকার নাই। জাস্ট শুরু করে দে। করতে করতেই একটা রুটিন দাঁড়িয়ে যাবে। কিছুদিন চলার পর সেই রুটিন চেইঞ্জ হয়ে অন্য রুটিন আসবে। এইভাবে একটু একটু করতে করতে কাজটা শেষ হবে।

মেইন কথা হচ্ছে, কনফিডেন্স তোর কাজ করে দিবে না। তোর কাজ করার এফোর্টই তোর কাজটা করে দিবে।

Inaction breeds doubt and fear. Action breeds confidence and courage. If you want to conquer fear, do not sit home and think about it. Go out and get busy. –Dale Carnegie

অক্টাল ডেসিমাল ছুতা খুঁজলেও, ভিতরে সব বাইনারি

শাবাব আরও বলতেছে–

লাইফে এমন অনেক সিচুয়েশন আসবে-যাবে। তবে দেখার বিষয় হচ্ছে তোর যখন যেটা করা দরকার সেটা তুই করে ফেলতেছস কি না। এখন সেই কাজটা কি তুই দশ দিন সময় নিয়ে করতেছস নাকি ত্রিশ দিনে জোড়াতালি দিয়ে করতেছস, সেটা ম্যাটার করবে না। ম্যাটার করবে তুই কাজটা ফিনিশ করছস কি করস নাই।

আর কোনো কিছু করতে না পারলে যে একটার জায়গায় দশটা অজুহাত দিবে। একজনের জায়গায় দশজনকে দোষ দিবে। একটা ভুল নাকি দশটা ভুল, সেটার লিস্ট তৈরি করবে। সে সাময়িক সান্ত্বনা পেলেও তার লাভের লাভ কিছুই হবে না। তার কন্ডিশন, সিচুয়েশন আগে যেখানে ছিল, সেখানেই থেকে যাবে।

অক্টাল ডেসিমাল সংখ্যা তো চিনস? এদের মধ্যে আটটা বা দশটা ডিজিট থাকে। যখন দরকার এক বা একাধিক অঙ্ক (সংখ্যা) ইউজ করতে পারবি। অন্যদিকে বাইনারি সংখ্যায় শুধু দুইটা অঙ্ক থাকতে পারে। হয় শূন্য না হয় এক। এ ছাড়া অন্য কিছু নাই। তেমনি লাইফের কোনো কিছু করতে গেলে– তোর উপসংহার জাস্ট দুইটা হতে পারে। হয় তুই কাজটা ফিনিশ করে ফেলবি। অথবা তুই কাজটা ছেড়ে দিবি। জাস্ট এইটুকুই। এই দুইটার মাঝখানে এই কারণ, ওই কারণ। এর পেটব্যথা, ওর আমাশয়। সেটা চিন্তা করে লাভের লাভ কিছু হবে না। ফলাফল যে আলু সেই বালুই থেকে যাবে।

তাই না পারার কারণ খুঁজবি না। কে হেল্প করছে আর কে কথা দিয়ে কথা রাখেনি, সেটার হিসাব করতে যাবি না। জাস্ট কাজটা করে ফেল। গড়িমসি না করে, মেইন কাজটা শুরু করে দে।

করলে কর, না করলে নতুন কিছু ধর।

অলসতার বড়ি গিললে, হতাশা পাবে কারখানা

ক্যাম্পাস ছেড়ে গেছে আরও দুই বছর। মাস্টার্সটা এর গ্র্যাজুয়েশন কমপ্লিট হয়েছে দুই মাস আগে। এই মাসেই বিদেশে প্রথম চাকরি শুরু করেছে সে। কিছুটা সেটেল হওয়ার চেষ্টা করতেছে। মাঝখানে বেশ কিছুদিন চরম ব্যস্ত থাকার পর ভার্সিটি ফ্রেন্ডদের সঙ্গে একটা অনলাইন আড্ডায় বসেছে। বিভিন্নজন বিভিন্ন স্মৃতিচারণামূলক কথা বলতে বলতে একসময় শাবাবের ক্লাসমেট জেরিন জিজ্ঞেস করল,

– শাবাব, তুই কি এখনো আগের মতো মোটিভেশন দিস। তোর মোটিভেশনে কিন্তু আমার কাজ হইছে?

শাবাব অবাক হয়ে বলল, তোকে আবার কবে মোটিভেশন দিলাম। ভার্সিটি লাইফে কখনোই তো তোর সঙ্গে আমার তেমন কথা হয়েছে বলে মনে হচ্ছে না।

– তুই আমাকে মোটিভেশন দিস নাই। তোর মোটিভেশন পাইছে জুনায়েদ। জুনায়েদের কাছ থেকে পাইছিল নাদিয়া। আর নাদিয়া আমাকে বলছিল। তুই নাকি অলস-কলস জুনায়েদকে বলছিলি–

ধর, একদিন ঘুম থেকে উঠেই দেখস বিছানায় টুপুসটুপুস পানি পড়তেছে। দেখেই তোর মেজাজটা খারাপ হয়ে গেল। কোনো রকমে পা সরিয়ে চোখ বন্ধ করতেই আটটার অ্যালার্ম বেজে উঠল। অনিচ্ছা সত্ত্বেও একটু পরে বিছানায় উঠে দাঁড়ালি। কোনো রকমে দাঁত ব্রাশ করে যখন দেখলি নাশতা করার কিছু নাই। তখন আরও মন খারাপ করে কিছু না খেয়েই ক্লাসে চলে গেলি। ক্লাস শেষ হওয়ার পর মনে হলো, দুর্ভিক্ষ। আজকে তো বাসায় খাওয়ার কিছু নাই। এখন কী করব? এই আফসোস করতে করতে, নিজের কপালের ১৪টা দোষ দিয়ে কোনার দোকানের বেঞ্চে বসে থাকলি। হতাশ মনে ভাবলি আমার লাইফে কেন এমন হচ্ছে? কী আমার অপরাধ?

আবার অন্য আরেকটা দিনের কথা চিন্তা কর–

ঘুম থেকে উঠেই দেখস বিছানায় টুপুসটুপুস পানি পড়তেছে। হায় হায় কী হলো বলে লাফিয়ে উঠলি। তড়িঘড়ি করে লেপ-তোশক যা

যা ছিল সেগুলা টেনে বাইরে রোদে দিলি। সঙ্গে সঙ্গে সকাল সাতটার অ্যালার্ম বেজে উঠল। অ্যালার্ম বন্ধ করে দাঁত ব্রাশ করতে করতে মনে হলো, হায় হায় নাশতা খাওয়ার কিছু নাই। তারপর মনে হলো দুদিন আগে টোস্ট বিস্কিট এনে রাখছিলি। কোনো রকমে পানি দিয়ে ভিজিয়ে চুবিয়ে টোস্ট বিস্কিট খেয়ে দৌড় দিলি ক্লাসের দিকে। ক্লাস শেষ করেই মনে হলো, হায় হায় আজকে তো মেসে খাওয়ার কিছু নাই। কিছুটা বিরক্ত হলি। তারপর নিজেকে সান্ত্বনা দিয়ে চলে গেলি কাঁচাবাজারের দিকে।

ওপরের দুইটা সিচুয়েশনেই— ঘটনা সেইম। কিন্তু ঘটনা ঘটার সঙ্গে সঙ্গে তুই কীভাবে রিঅ্যাক্ট করছস। কোন নেক্সট স্টেপ নিচ্ছস। সেটার ওপরে নির্ভর করে তোর মানসিকতা তোর থিংকিং পুরাই উল্টা দিকে চলে যাচ্ছে।

একটু ভালো করে চিন্তা করলে বুঝতে পারবি। আমাদের সবার লাইফে কম-বেশি ভালো বা খারাপ ঘটনা ঘটে। তবে সেই সব ঘটনায় কে কীভাবে রিঅ্যাক্ট করছে, সেটার এগিনিস্টে কে কী অ্যাকশন নিচ্ছে। তার ওপরে নির্ভর করবে তুই হতাশ হবি নাকি চার্জড হবি।

এইবার আবার চিন্তা করে দেখ। মানুষ কী কী কারণে হতাশ হয়:

১. কোনো একটা কিছু হলে তোর যদি কিছু করার থাকে। সেটা সঙ্গে সঙ্গে করে ফেলবি। দেরি করবি না। তাহলে জিনিসটা আর তোর ভিতরে খচমচ খচমচ করবে না।

ধর, তোর পরীক্ষার রেজাল্ট খারাপ হইছে। এখন এটা নিয়ে চুপচাপ বসে থাকলে তোর মন খারাপ তো হবেই। আর যদি কেন খারাপ হলো সেটার কারণ খুঁজে বের করস। সেই অনুসারে পড়ার পরিমাণ বাড়িয়ে দিস। আগে যেখানে ডেইলি তিন ঘণ্টা পড়ালেখা করতি, এখন সেখানে ছয় ঘণ্টা পড়া শুরু করে দিলি। নিজের হার্ডওয়ার্কের পরিমাণ বাড়িয়ে দিলি। সেটা করলে কয়দিন পর ঠিকই রেজাল্ট ভালো হবে। আর মন খারাপ করার, হতাশ হওয়ার সুযোগই পাবি না। অন্যদিকে তুই কিছু না করে চুপচাপ বসে থাকলে তোর হতাশা বাড়তেই থাকবে।

[illegible]

[illegible] থাকবে না। [illegible] এ ক্ষেত্রে তুই ঐ [illegible] মাঝেই যোগ, ভাগ করিয়ে তোর কাজটা কীভাবে শেষ করা যায়, সেই চিন্তা করবি। হয়তো কোনদিন তুই কোন [illegible] তার আগের দিন কাজটা সেরে ফেলবি কিংবা সারা দিন কারেন্ট থাকবে না জেনে তুই সারারাত জেগে জেগে কাজ করবি আর সারা দিন যখন কারেন্ট থাকবে না, তখন শুয়ে শুয়ে ঘুমাবি। অর্থাৎ অবস্থা যেমনই হোক সেই অনুসারে তার ব্যবস্থা নিবি। তাহলে কিন্তু তোর কাজ হয়ে যাবে এবং হতাশ হওয়ার অপশন আসবে না।

আর যদি কাজ না করে অলস-কলস হয়ে বসে থাকস। তাহলে হতাশ হওয়া শুরু হবেই। কারণ–'অলস আর আরামের শরীর হতাশার কারখানা।' এইটা আমার কথা না। এইটা জনদরদি কবি শাবাবের কথা। এই মর্মে কবি আরও বলেছেন–

অ্যাকশন না নিয়ে বসে থাকলে চুপচাপ

হয়ে যাবি হতাশার ক্যাচাপ।

[পাশ থেকে আমিন্ন চিপ্পনী কেটে বলে]

না না। কবি শাবাব তো হাইনামিক কবি। সে কালকে আবার এই কবিতা চেইঞ্জ করে ফেলছে। কালকেই আমাকে বলছে–

হাত-পা ছেড়েছুড়ে বসে থাকতে মানা

মনখারাপ সুযোগ পেলে ফুটাবে তার ফানা

তেজিতার পায়ের হয়ে হারাবে ঠিকানা

কারণ, অলস মস্তিষ্কই হতাশার কারখানা।

তোকে হতেই হবে। কেউ চাইলেই যেমন তোকে ভালোবাসতে পারে। আবার চাইলেই তোকে ছেড়েও যেতে পারে। সেটা তার অধিকার, তার বিবেচনা, তার লাইফ। আর তোর লাইফ হচ্ছে– রিলেশনের বিষয়ে আবেগটা লিমিটের মধ্যে রাখা। কারণ, লাইফে রিলেশনের দরকার আছে। কিন্তু রিলেশন, লাইফের চাইতে বড় কিছু না।

বাজে অভ্যাসে অ্যাডিকটেড হওয়া যাবে না

লাইফটাকে লাইনে রাখার যদি দুইটা রাস্তা থাকে, তাহলে বেলাইনে যাওয়ার ২০টা রাস্তা আছে। ইন্টারনেট আছে। আশপাশের দুষ্টু ফ্রেন্ড আছে। ফেইক প্রোফাইল থেকে রোমান্টিক মেসেজের পর আছে। টিভিতে খেলা আছে। রুমে মুভি আছে। তাই কোনো কিছুতে হারিয়ে যাওয়ার আগে দেখবি, জিনিসটা কী। খেয়াল রাখবি– how much is too much. ইন্টারনেটে ৩০% এনজয় করবি আর ৭০% সময় কাজে লাগাবি।

আজাইরা স্ট্রেস নেওয়া যাবে না

শখ করে স্ট্রেস নেওয়ার একটা ট্রেন্ড হয়ে যাচ্ছে। এই যেমন ধর, পাস করলে আমাকে কে চাকরি দিবে? বাবা-মা আর ফ্যামিলির হাল কেমনে ধরব? আমি তো ওদের মতো না। – এই সব নিয়ে আজাইরা টেনশন করা যাবে না। ইনফ্যাক্ট, লাইফে কখনোই এমন কিছু নিয়ে চিন্তা করতে যাবি না, যেটা নিয়ে তুই এই মুহূর্তে কিছু করতে পারতেছস না। শুধু– কিছু করতে পারলে, চিন্তা বাদ দিয়ে সেটা করা শুরু করে দিবি। নচেৎ তোর যেটা করা উচিত, সেটা কর। মাগার, বসে বসে টেনশন করবি না।

অতীতের গ্লোরী আঁকড়ে ধরা যাবে না

তুই আগে কী ছিলি। স্কুল-কলেজে কী উল্টায় ফেলছিলি, সেটা এখন আর কেউ গোনায় ধরবে না। পড়ালেখার কয় বছর গ্যাপ দিছস। কয়টা ভুল ডিসিশন নিছস, সেগুলা নিয়েও নাক চুলকাবি না। সো,

সেগুলা সব প্ল্যান বিনে ফেলে দিয়ে, সামনের দিকে তাকা। আজকের অবস্থা যতই গুবলেটমার্কা হোক না কেন, আজকে এই মুহূর্ত থেকে কী করতে পারবি, সেটাতে ফোকাস কর।

আবার কখনোই বলতে যাবি না, আমি এইটা ডিজার্ভ করি বা আমি এর চাইতে ভালো কিছু ডিজার্ভ করি। কারণ, সত্যি কথা হচ্ছে, তুই যেটা পাইছস, সেটাই তুই ডিজার্ভ করস। এখন সেটা তোর ভালো লাগুক বা না লাগুক। সেটা দিয়ে দুনিয়ার কারও তেমন কিচ্ছু যায়-আসে না। তুই যতটুকু এফোর্ট দিছস, সেই অনুসারেই পাইছস। এর চাইতে ভালো কিছু ডিজার্ভ করলে নেক্সট টাইম ভালো করে চেষ্টা করবি। তারপরও ডিজার্ভ করি বলে, আজীবনের জন্য পূজার পজিশন রিজার্ভ করে বসে থাকবি না।

লেজ গুটিয়ে বসে থাকা যাবে না

কখনোই লেজ গুটিয়ে বসে থাকবি না; বরং অপরিচিত মানুষের সঙ্গে কথা বলার অ্যাপ্রোচ করতে হবে। তাদের সঙ্গে একসঙ্গে কাজ করা। তাদের লিড করা। এক একজনের সাইকোলজি বুঝে তাকে দিয়ে কাজ বের করে নিয়ে আসার টেকনিক জানা খুবই জরুরি। এইটা শুধু ভার্সিটির ট্যুর, ইভেন্ট ম্যানেজ, প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট বা বাজেটিংয়ের ক্ষেত্রেই না; বরং প্রফেশনাল লাইফে ম্যানেজার বা প্রজেক্ট লিড করতে অনেক হেল্প করে।

এ ছাড়া কমিউনিকেশন স্কিল। যেমন Email etiquette, নেটওয়ার্কিং, প্রেজেন্টেশন স্কিল, নেগোসিয়েশন স্কিল, পাবলিক স্পিকিংয়ের মতো কিছু ইম্পর্ট্যান্ট জিনিস ভার্সিটি লাইফে শেখা উচিত।

মন খারাপ করতে পারস মাগার হতাশ হওয়া যাবে না

লাইফে অনেক কিছুতেই মন খারাপ হবে। হার্ড টাইম আসবে। অন্যরা জোর করে মাইনকার চিপায় ফেলে দিবে। তোর নামে প্রমাণসহ মিথ্যা কথা বলে বসবে। পার্সোনাল ম্যাটার নিয়ে তোকে শুনিয়ে শুনিয়ে কানাঘুষা করবে। টিটকারি মারবে। কিন্তু একদিনের মন খারাপ

পরের দিনে টেনে নেওয়া যাবে না; বরং কোনো দিন খুব বেশি মন খারাপ হলে, গোসল করে সব মন খারাপ ধুয়ে ফেলবি। দরকার হলে সব মন খারাপ বাথরুমের কমোডে ফ্লাশ করে দিবি। কারণ তোর লাইফের প্রতিটা দিন হবে এক একটা ফ্রেশ দিন। যেখানে আগের দিনের হতাশা, মন খারাপ তোকে পিছনে টেনে নিবে না। তাহলেই তোর লাইফ প্যারাহীন হয়ে উঠবে।

ইগোর দেয়াল তৈরি করা যাবে না

ইগো, আত্ম-অহংকার, সুপিরিওরিটি কমপ্লেক্স বা ইনফিরিওরিটি কমপ্লেক্স তোর চারপাশে দেয়াল তৈরি করে দেয়। তোর ইগো যত বেশি হবে, অন্যদের কাছ থেকে শিখা তত কঠিন হবে। অন্য কারও থেকে তত বেশি পিছিয়ে পড়বি। তুই একসময় কই পড়ছিলি, কী খাইছিলি, কী রেজাল্ট করছিলি, তোর বাপ কী ছিল, এগুলা আজীবন গোনার টাইম তোর থাকতে পারে, দুনিয়ার অন্য কারও নাই। সো, ইগোর মুখোশ ছাড়। একজন বিনয়ী, নম্র, ভদ্র মানুষ হওয়ার চেষ্টা কর। লাইফ অনেক সহজ ও মজার হয়ে উঠবে।

কমপ্লেইন বা অজুহাতের বাক্স খোলা যাবে না

অজুহাত, অভিযোগ বা কমপ্লেইন করতে চাইলে করে শেষ করা যাবে না। সো, এই জিনিস কাজ হচ্ছে না। ওইভাবে করলে হবে না। সে কেন আমার দিকে তাকাল না? তার নাক ব্যাঁকা কেন? রাস্তার পাশে বৃক্ষ কেন? বৃক্ষের গোড়ায় শিকড় কেন? শিকড়গুলা চিকন কেন? এমন শত শত কমপ্লেইন, অভিযোগ বা অজুহাত করে খুব বেশি চেইঞ্জ করতে পারবি না; বরং তোর নিজের ভিতরেই অশান্তি বাড়বে।

রাগ (মেজাজ খারাপ) বাড়তে দেওয়া যাবে না

রাগ দেখানো বা মেজাজ খারাপ করা বোকা মানুষের কাজ। রেগে যাওয়ার মানে হচ্ছে, তোর চিন্তা করার অ্যাবিলিটি ফ্রিজ করে দেওয়া। সবচেয়ে বিচক্ষণ ব্যক্তি রেগে গিয়ে সবচেয়ে স্মার্ট চাল চালে না; বরং

মাথা কুল রেখেই আসল ঘুঁটির দান দেয়। সো, তুই মাথা গরম করে, দশ মিনিট চিল্লাচিল্লি করে সাময়িক অ্যাটেনশন পেতে পারস। মাগার শেষ দান খেলবে মাথা ঠান্ডাওয়ালা ব্যক্তিটাই। সে জন্যই তো কথায় বলে, রেগে গেলেন তো হেরে গেলেন।

জাস্ট সিম্পল একটা টার্গেট সেট কর। নিজের পার্সোনাল গ্রোথ, মেন্টাল গ্রোথ, প্রফেশনাল গ্রোথের রাস্তাটা চালু রাখার চেষ্টা কর। তার পাশাপাশি লিমিটেড পরিমাণ এনজয় কর। তাইলেই হবে।

> সেই যে ই-মেইল চালাচালি শুরু হলো। সেই ই-মেইল চলতেছে তো চলতেছে। প্রতিদিন দুই-তিনটা করে ই-মেইল আসে আর রিপ্লাই যায়।
>
> তবে ই-মেইলের বিষয়বস্তু যে আগের মতোই আছে তা কিন্তু না। বরং ধীরে ধীরে সেটা ILU, IMU তে রূপান্তরিত হয়ে গেছে।

এই যে তুই, হ্যাঁ তুই। যে এই বইটা পড়লি। কিছু সময় দিলি। সেই সময়গুলার চার আনা পয়সার দাম নাই। যদি এই বই থেকে দুই-চারটা জিনিস তুই তোর লাইফে কাজে না লাগাস। তুই যদি কিছু চেইঞ্জ আনার চিন্তা না করস। তুই যদি একটু চেষ্টা না করস। একটু যদি চেখে না দেখস। তাহলে দুনিয়ার সবাই এসে তোকে হাজারো হাজারো টিপস দিলেও তোর লাইফের কিছুই চেইঞ্জ হবে না। তোর লাইফটা যদি চেইঞ্জ করতে হয়, তোর ড্রিমগুলা যদি বাস্তবে নিয়ে আসতে হয়, তাহলে তোকে সময় দিতে হবে। তোকেই চেষ্টা করতে হবে। তুই সময় দিলে, তুই চেষ্টা করলে, তুই ঘাম ঝরালে সেটার ফলও তুই পাবি।

জীবন তোর, চেষ্টা তোর। অর্জনের মুকুটও তোর।

ক্যালরি ঝরাও ক্যালসিয়াম বাড়াও

তোর মেরুদণ্ড দেখতে চাস? যা, দুই পাতা উল্টিয়ে মেরুদণ্ডটা দেখে আয়। আপাতত মেরুদণ্ডের হাড্ডি ফাঁকা। ভিতরে কিছু নাই। তাই নিচের প্রশ্নগুলার উত্তর অনুসারে মেরুদণ্ডের হাড্ডি ভরাট করবি। একটা কলম বা পেনসিল দিয়ে। তারপর মেরুদণ্ডের নিচে তোর নাম লিখে এই মেরুদণ্ডের ছবি পোস্ট করে দিবি ফেসবুকে আর ট্যাগ করে দিবি Jhankar Mahbub-কে। তাহলে সে এসে তোকে ফিডব্যাক দিয়ে দিবে। আর পোস্টের মধ্যে অবশ্যই একটা হ্যাশট্যাগ দিবি #chestar_gymnasium_future_er_calcium

১. তুই যেটাই সিরিয়াসলি করস না কেন, সেটার জন্য ডেইলি কত ঘণ্টা সময় দেস? যদি ১০০% ফোকাসড থেকে মিনিমাম ৪ ঘণ্টা বা তারও বেশি দিয়ে থাকস, তাহলে পরের পাতায় গিয়ে দুইটা হাড্ডি ভরাট করবি। আর যদি ২ থেকে ৩ ঘণ্টা সময় দিয়ে থাকস, তাহলে একটা হাড্ডি ভরাট করবি। তার চাইতে কম সময় দিলে কোনো হাড্ডি ভরাট করার দরকার নাই।

২. তুইও কি নিজেই নিজেকে ডেডলাইন দিস? যে অমুক কাজটা ওই দিনের মধ্যে বা ওই সময়ের মধ্যে শেষ করতে হবে? এবং সেই ডেডলাইনের মধ্যে কাজটা ফিনিশ করার জন্য ডেসপারেট থাকস? যদি ৭০-৮০% বা তারও বেশি ক্ষেত্রে ডেডলাইনের মধ্যেই কাজটা ফিনিশ করতে পারস তাহলে দুইটা হাড্ডি ভরাট কর। আর যদি ৫০% বা তারও বেশি সময় পারস তাহলে একটা হাড্ডি ভরাট কর। আর তার চাইতে কম হলে কোনো হাড্ডি ভরাট করার দরকার নাই।

৩. প্রতিদিনের জন্য তুই কি মিনিমাম একটা করে টার্গেট বা গোল সেট করস? এবং সেটা ফিনিশ করার জন্য জানপ্রাণ দিয়ে চেষ্টা করস? যদি সপ্তাহে অন্তত পাঁচ দিন তুই তোর ডেইলি গোল ফিনিশ করতে পারস, তাহলে দুইটা হাড্ডি ভরাট করবি। আর যদি সপ্তাহে অন্তত তিন দিন তোর ডেইলি গোল অ্যাচিভ করতে পারস, তাহলে একটা হাড্ডি ভরাট করবি। আর কখনো তোর ডেইলি গোল সেট না করলে কোনো হাড্ডি ভরাট করার দরকার নাই।

৪. যাদের সঙ্গে তোর নিয়মিত কথাবার্তা বা চ্যাট হয়, এমন চার-পাঁচজনের কথা চিন্তা কর। এখন আবার চিন্তা করে দেখ। তুই যে জিনিস করতে চাস বা তুই যে ক্যারিয়ার ডেভেলপ করতে চাস, তারা কি সেই লাইনে তোর চাইতে এগিয়ে আছে? যদি চারজনই সেই একই লাইনে তোর চাইতে এগিয়ে থাকে এবং তুই তাদেরকে সাইলেন্টলি কম্পিট করস, তাহলে দুইটা হাড্ডি ভরাট কর। আর যদি মিনিমাম একজনকে সাইলেন্টলি কম্পিট করস, তাহলে একটা হাড্ডি ভরাট কর।

৫. প্রতিদিন জেগে থাকা অবস্থায় তুই কত ঘণ্টা সময় ইচ্ছা করে মোবাইল ফোন সাইলেন্ট বা বন্ধ করে রাখস? যদি ৪ ঘণ্টা বা তারও বেশি সময় বন্ধ করে রাখস, তাহলে দুইটা হাড্ডি ভরাট কর। যদি ১ থেকে ৩ ঘণ্টা হয়, তাহলে একটা হাড্ডি ভরাট কর। আর যদি কখনোই ইচ্ছা করে সাইলেন্ট বা বন্ধ করে না রাখস, তাহলে কোনো হাড্ডি ভরাট করার দরকার নাই।

৬. ফিউচারে ক্যারিয়ার বা চাকরি পেতে হেল্প করতে পারে এমন কয়জন মামা-খালুর সঙ্গে তোর কানেকশন আছে? অন্তত দরকার হলে তাদের ই-মেইল বা ফোন কল বা চ্যাটে মেসেজ পাঠাতে পারবি? এমন যদি ১০ জন বা তার বেশি থাকে, তাহলে দুইটা হাড্ডি ভরাট কর। আর যদি পাঁচজনের বেশি থাকে, তাহলে একটা হাড্ডি ভরাট কর। এর কম থাকলে কোনো হাড্ডি ভরাট করার দরকার নাই।

৭. কোনো সিরিয়াস বা মেগা সিদ্ধান্ত নিতে কি তুই এক সপ্তাহের বেশি সময় নষ্ট করস? কোনো মেজর ডিসিশন হলে তুই কি এক দিনের বেশি সময় নষ্ট করস? করে থাকলে কোনো হাড্ডি ভরাট করার দরকার নাই। আর যদি মাঝেমধ্যে করস, তাহলে একটা হাড্ডি ভরাট কর। আর যদি সব সময় ওয়ান-ওয়ান-ওয়ান ফর্মুলা অ্যাপ্লাই করে থাকস, তাহলে দুইটা হাড্ডি ভরাট কর।

৮. যে মুহূর্তে তুই একা থাকস, সেই মুহূর্তে তুই কি সিরিয়াসলি যে কাজটা করা দরকার, সেটা করতে পারস? নাকি ইন্টারনেট, ফেসবুক, ইউটিউব, ভিডিও গেমস বা অন্য কিছুতে হারিয়ে যাস? যদি ৮০% বা তারও বেশি টাইম ফোকাসড থাকতে পারস, তাহলে দুইটা হাড্ডি ভরাট কর। আর যদি ৫০% বা তারও বেশি টাইম লাইনে থাকতে পারস, তাহলে একটা হাড্ডি ভরাট কর। এর কম হলে কোনো হাড্ডি ভরাট করার দরকার নাই।

৯. তোর যখন পড়া দরকার বা কোনো কিছু সিরিয়াসলি করা দরকার, তখন কি তুই কড়া একটা রুটিন/আউটলাইন বানিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারস? এবং সেই আউটলাইন অনুসারে ১00% কমিটেড থেকে কাজটা চালিয়ে যেতে পারস? যদি পেরে থাকস তাহলে দুইটা হাড্ডি ভরাট কর। আর যদি মাঝেমধ্যে পেরে থাকস, তাহলে একটা হাড্ডি ভরাট কর।

১০. তোর কাছে যেভাবেই টাকা পয়সা আসুক না কেন, তুই কি তার কিছু অংশ সেইভ করে রাখস? এবং খুব বেশি ধারদেনা করা লাগে না? তাহলে দুইটা হাড্ডি ভরাট করবি। আর যদি মাঝেমধ্যে ধারদেনা করা লাগে, তাহলে একটা হাড্ডি ভরাট করবি।

১১. তুই কি অতিরিক্ত ইমোশনাল হয়ে যাস? আবেগকে কন্ট্রোল করতে পারস না? বা প্রচণ্ড রাগ হয়ে গেলে মেজাজ কন্ট্রোলে রাখতে পারস না? এমন যদি হয়, তাহলে কোনো হাড্ডি ভরাট করার দরকার নাই। আর যদি মাঝেমধ্যে হয়, তাহলে একটা হাড্ডি ভরাট কর। আর যদি সব সময় ইমোশন কন্ট্রোল করতে পারস, তাহলে দুইটা হাড্ডি ভরাট কর।

১২. তুই কি একটা বা তার বেশি ক্লাব, অর্গানাইজেশনের সঙ্গে জড়িত? সেখানে কিছু করার চেষ্টা করস? তাদের ম্যানেজ করা বা লিড দেওয়া? যদি করে থাকস, তাহলে একটা হাড্ডি ভরাট কর। না করলে কোনো হাড্ডি ভরাট করার দরকার নাই।

১৩. তুই সময় পেলে পড়ালেখার বাইরে শিক্ষণীয় বই, অনলাইন কোর্স বা শিক্ষণীয় ভিডিও দেখে দেখে বা কোনো সফটওয়্যার সম্পর্কে দক্ষতা অর্জন করার চেষ্টা করস? করে থাকলে একটা হাড্ডি ভরাট কর। না করে থাকলে কোনো হাড্ডি ভরাট করার দরকার নাই।

১৪. কোনো একটা কাজ করা লাগলে তুই যদি কোনো কারণে পিছিয়ে পড়লে হতাশ হয়ে যাস, তাহলে কোনো হাড্ডি ভরাট করার দরকার নাই। আর তুই যদি একটু গ্যাপ পড়লেও আবার শুরু করে দিতে পারস, আবার নতুন করে নতুন উদ্যমে লেগে থাকতে পারস, তাহলে একটা হাড্ডি ভরাট কর।

১৫. পড়ালেখার বাইরে যদি মিনিমাম একটা জিনিস নিয়ে তোর শেখার আগ্রহ থাকে বা এক্সট্রা কারিকুলার কিছু একটা করার চেষ্টা করস, তাহলে একটা হাড্ডি ভরাট কর।
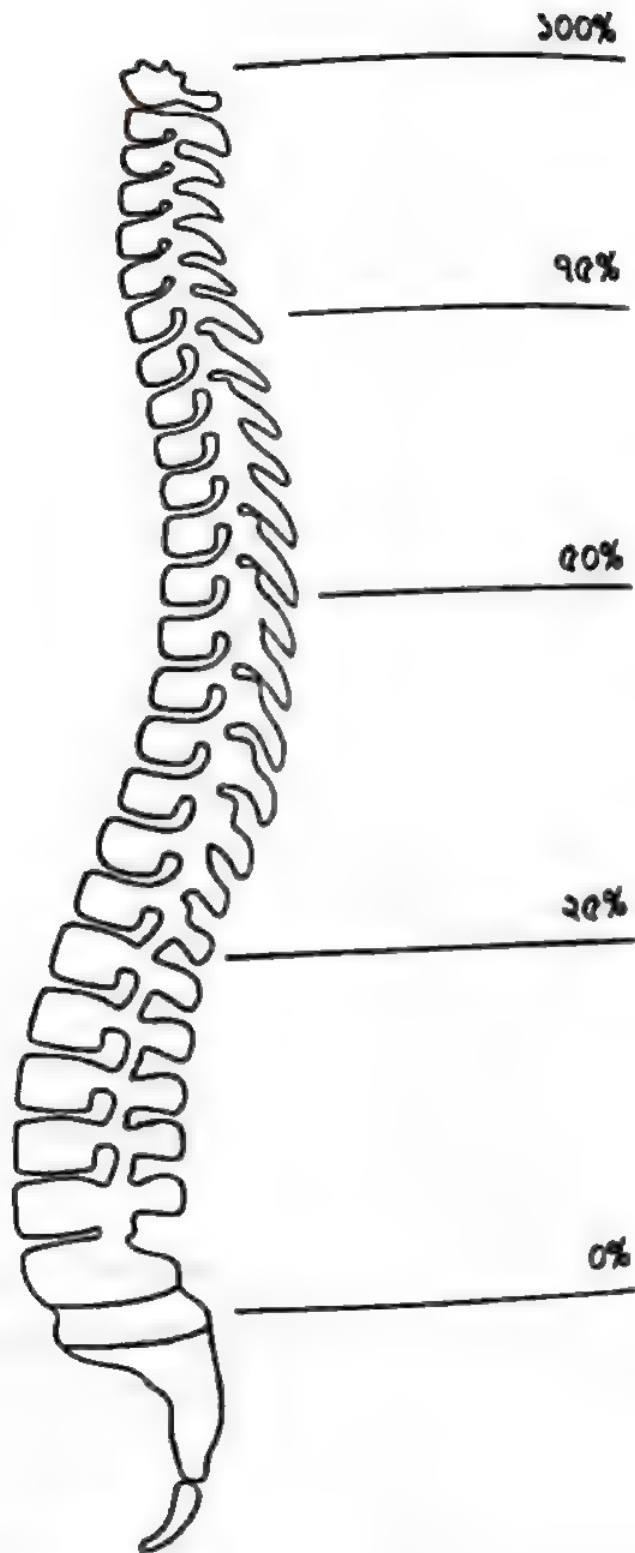
মেরুদণ্ডের মালিক: ------------------------------

একটু আগে তুই যে হাড্ডি ভরাট করছিলি, সেখানে তোর কয়টা হাড্ডি ভরাট হইছে, সেই অনুসারে তুই নিচের চারটা ভাগের মধ্যে কোন ভাগে পড়স?

০-২৭ শতাংশ: যদি তোর হাড্ডির শক্তি ২৭% বা তার কম হয়, তাহলে তোর হালুয়া টাইট। একটু সিরিয়াসলি তোর কন্ডিশন চেইঞ্জ করতে হবে। ভালো হয় কড়া একটা ডেডলাইন সেট করে, মোবাইল বন্ধ করে নেক্সট সাত দিনের একটা চ্যালেঞ্জ নে। ধীরে ধীরে নিজেকে চেইঞ্জ করার মিশনে নাম। দরকার হলে কারও হেল্প নে। ধৈর্য ধরে শুরু করে দে। সময় লাগবে। তবে সব লাইনে চলে আসবে।

২৮-৫০ শতাংশ: তোর অবস্থা ২৮ থেকে ৫০-এর মধ্যে থাকলে, তুই কোনো রকম টেনেটুনে চলতেছস। তোর দুই-একটা এরিয়ায় ভালো করতে হবে। তাই আগের পাতায় গিয়ে দেখ কোন জিনিসটায় ঘাটতি পড়ে গেছে। সেই জিনিসটার জন্য একটা টার্গেট সেট করে কাজ শুরু করে দে। তারপর দুই মাস পরে আবার এই হাড্ডির ক্যালসিয়াম মাপার জিনিসটা চেক করে দেখ। তাহলে বুঝতে পারবি তোর শক্তি বেড়ে যাচ্ছে।

৫১-৮০ শতাংশ: তুই যদি ৫১ থেকে ৮০-এর মধ্যে থাকস, তাহলে তুই মোটামুটি ভালো আছিস। এইভাবে থাকার চেষ্টা করতে থাক। খুব ইচ্ছা হলে যে দুই-একটা মিস গেছে, সেখান থেকে একটা বা দুইটা শুরু করে দে। তাহলে কয়েক দিন পর তুই টপ পারফর্মার হয়ে যাবি।

৮০-১০০ শতাংশ: তুই মেগা পারফর্মার। সলিড হার্ডওয়ার্কার। তুই ফাইটার। তোর স্টাইলটা ধরে রাখ। চালাতে থাক। তুই অনেক অনেক ভালো করবি।

চেষ্টার জিমনেসিয়াম

কখনো হাড্ডির জোর কমে গেলে, ক্যালসিয়ামের অভাব হয়ে গেলে, এই বইটা পড়ে ফেলবি। দরকার হলে বইয়ের যে অংশ যখন দরকার পড়বে, তখন সেই অংশ পড়ে ফেলবি। দাগিয়ে দাগিয়ে পড়বি। তারপর বই অনুসারে তোর লাইফের স্ট্র্যাটেজি ডেভেলপ করে ফেলবি। এরপর সেই অনুসারে বাম্বু রেডি করে ডেডলাইন সেট করে ঝাঁপিয়ে পড়বি।

প্রতিদিন মিনিমাম একটা গোল রাখবি। যাতে সেই দিনটা তোর কাজে লেগে যায়। আর কখনো কোনো কিছু করতে ইচ্ছা না করলে, মন না চাইলে বা টায়ার্ড লাগলে, হালকা একটু রেস্ট নিয়ে নিজেই নিজেকে বলবি–

কষ্ট করা মানে শক্তি সামর্থ্য আর ক্যালসিয়াম বাড়ানো। আজকে কিছু হোক বা না হোক, আমি লেগে থাকব। এই করে ফেলব। আমি করে দেখাব। আমি পারব। অবশ্যই পারব।

আর কোনো কারণে নিজেকে গাইডলাইন দিতে না পারলে বিস্তারিত লিখে ই-মেইল পাঠিয়ে দিবি jhankar.mahbub@gmail.com-এ। আর ই-মেইল পাঠানোর সময় ই-মেইলের সাবজেক্ট হিসেবে Chesta er Gymnasium Future er Calcium লিখে দিবি।

আজকের চিন্তাভাবনাগুলা, আজকের ডিসিশন এবং আজকের অ্যাকশন আইটেমগুলা নিচে লিখে রাখো।

নেক্সট এক বছরের মধ্যে আমি এই জিনিসটা অর্জন করবই করব।

আমার লক্ষ্য–

আমার লক্ষ্য অর্জনের জন্য আজকে থেকে আমি এই তিনটা সময় নষ্টকারী কাজ করা বন্ধ করে দিব।

১.

২.

৩.

আমার লক্ষ্য অর্জন করার জন্য আজকে থেকে এই তিনটা আরও বেশি বেশি করে প্রতিদিন করব।

১.

২.

৩.

বাদুড় খাও, ক্যালসিয়াম বাড়াও

তিন-তিনবার পুরস্কারজয়ী লেখক, ঝংকার মাহবুব। ক্লাস সেভেনে থাকা অবস্থায় জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবনী নিয়ে রচনা প্রতিযোগিতার হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ে তিনি তৃতীয় স্থান দখল করেন। একই বছর প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের জীবনী নিয়ে আয়োজিত রচনা প্রতিযোগিতায়ও তৃতীয় স্থান অর্জন করেন। এমনকি সেই একই বছরের আমার প্রিয় ব্যক্তিত্ব নিয়ে রচনা প্রতিযোগিতায়ও তিনি তৃতীয় স্থানই দখল করেন। ওনার তিন-তিনবার তৃতীয় স্থান দখল করা নিয়ে পিঞ্চ মেরে কেউ যদি জিজ্ঞেস করে বসে, আপনি বারবার থার্ড পুরস্কার পাচ্ছেন। আপনি'কি থার্ডক্লাস রাইটার? এমন বেফাঁস প্রশ্ন শুনলে উনি কিঞ্চিৎ অপ্রস্তুত হয়ে 'আমার বাথরুম চাপছে' বলে পেছনের দরজা দিয়ে পাশ কাটেন।

তিনবার ম্যারাথন দৌড়, স্কাইডাইভ, টাফ মাডার আর প্রোগ্রামিং হিরো নামক স্টার্টআপ নিয়ে গুঁতাগুঁতি করার পাশাপাশি 'ডালে লবণ কম না বেশি হয়েছে' সেটা নিয়ে জাভাস্ক্রিপ্ট দিয়ে কোড লিখে প্রোগ্রামার বউয়ের সাঙ্গে কথা-কাটাকাটি করেন। এসব কাজের মধ্যে ফাঁকফোকর পেলেই ইউটিউব, ফেসবুকে সচল থাকার পাশাপাশি নিয়মিত গোসল করেন বলেও দাবি করেন।

facebook.com/JhankarMahbub